ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্থানীয় সরকার খাত
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৫ মে ২০১৪

স্থানীয় সরকার খাতঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. রবিউল ইসলাম, *অ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
নাহিদ শারমীন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
ফারহানা রহমান, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অংশীজন তথ্যদাতাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাধন কুমার দাস, এবং তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য নাজমুল হুদা মিনা এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	*VII*
অধ্যায় এক	
ভূমিকা	**০১**
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	০১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	০২
১.৩ গবেষণার পরিধি	০২
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	০৩
১.৪.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	০৩
১.৫ তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ	০৪
১.৬ গবেষণার সময়	০৪
১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	০৪
১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো	০৪
অধ্যায় দুই	
স্থানীয় সরকার খাত: বিবর্তন, কাঠামো, কার্যাবলী ও অর্জন	**০৫**
২.১ স্থানীয় সরকার খাতের বিবর্তন	০৫
২.২ স্থানীয় সরকার খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	০৬
২.৩ স্থানীয় সরকার খাতের কার্যাবলী	০৭
২.৪ স্থানীয় সরকার খাতের সাম্প্রতিক কিছু অর্জন	০৮
২.৫ উপসংহার	০৯
অধ্যায় তিন	
প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম	**১০**
৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম	১০
৩.১.১ আইন ও বিধি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা	১০
৩.১.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম	১১
৩.১.২.১ স্থায়ী কমিটি গঠন	১১
৩.১.২.২ অকার্যকর স্থায়ী কমিটি	১১
৩.১.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম	১১
৩.১.৩.১ জনবলের স্বল্পতা	১১
৩.১.৩.২ নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম	১২
৩.১.৩.৩ পদায়ন সংক্রান্ত অনিয়ম	১২
৩.১.৩.৪ বদলি সংক্রান্ত অনিয়ম	১২
৩.১.৩.৫ পদোন্নতি সংক্রান্ত অনিয়ম	১২
৩.১.৩.৬ সম্মানী ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম	১২
৩.১.৩.৭ দক্ষতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম	১৩
৩.১.৪ বাজেট প্রস্তুতি ও বরাদ্দ বিতরণ	১৩
৩.১.৫ তথ্যের উন্মুক্ততা	১৫
৩.১.৬ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	১৫
৩.১.৬.১ নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে অবৈধ লেনদেন	১৫
৩.১.৬.২ নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী অনিয়মের ধরন	১৬
৩.১.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৬
৩.১.৭.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডি থেকে পরিবীক্ষণের ঘাটতি	১৬
৩.১.৭.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যাবলী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পরিবীক্ষণ করা	১৬
৩.১.৭.৩ পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়	১৬
৩.১.৭.৪ গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা না পাওয়া	১৬

৩.১.৭.৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার প্রভাব ১৬
৩.১.৭.৬ প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকরতা ব্যাহত ১৬
৩.১.৮ আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের অভাব ১৭
৩.২ অবকাঠামোগত সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা ১৭
৩.২.১ লজিস্টিকসের পর্যাপ্ততা ও ব্যবহার ১৭
৩.৩ উপসংহার ১৭

অধ্যায় চার

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং ক্রয়ে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ১৮
৪.১ প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায় ১৮
৪.১.১ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ১৮
৪.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যা ১৮
৪.১.২.১ ধারণা হতে উন্নয়নমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতা ১৮
৪.১.২.২ প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব ১৮
৪.১.২.৩ রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন ১৯
৪.১.২.৪ সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন ১৯
৪.১.২.৫ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব ১৯
৪.২ উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন পর্যায় ১৯
৪.২.১ দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ২০
৪.২.২ কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ২১
৪.২.৩ কার্যাদেশ পাওয়ার পর বিক্রি করা ২১
৪.২.৪ বিল এবং জামানতের টাকা উঠানোর ক্ষেত্রে সমস্যা ও অনিয়ম ২১
৪.২.৪.১ কাজ চলাকালীন ও বিল উঠানোর জন্য কমিশন আদায় ২১
৪.২.৪.২ জামানত এবং বিলের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ২২
৪.২.৫ বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ ২২
৪.৩ লজিস্টিকস ক্রয় প্রক্রিয়া এবং অনিয়ম ২২
৪.৪ উপসংহার ২৩

অধ্যায় পাঁচ

সেবামূলক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৪
৫.১ সনদ ও সনদ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৪
৫.২ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৪
৫.৩ বিচার ও সালিশ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৬
৫.৪ ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৬
৫.৫ হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ ও প্রদানে অনিয়ম ২৭
৫.৫.১ মূল্য নির্ধারণ এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা ২৭
৫.৫.১.১ কম বা অধিক মূল্য নির্ধারণ ২৭
৫.৫.১.২ অনিয়মিত পুনঃমূল্য নির্ধারণ ২৮
৫.৫.১.৩ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা ২৮
৫.৫.১.৪ 'ম্যানুয়াল' পদ্ধতিতে কর ব্যবস্থাপনা ২৮
৫.৫.১.৫ আঞ্চলিক অফিস এবং বাড়ি থেকে হোল্ডিং কর আদায়ের ব্যবস্থা ২৮
৫.৬ পানি পরিসেবা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৮
৫.৭ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ২৯
৫.৮ উপসংহার ৩০

অধ্যায় ছয়

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ৩১
৬.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ৩১
৬.২ আর্থিক সক্ষমতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ৩২
৬.২.১ সরকারের বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল বাজেট পরিকল্পনা ৩২

৬.২.২ বাজেটে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়া ৩২
৬.২.৩ নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা ৩২
৬.৩ জবাবিদিহিতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ৩৩
৬.৩.১ আর্থিক জবাবদিহিতার অভাব ৩৩
৬.৩.২ প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব ৩৩
৬.৩.৩ বাজেটে জনমতের প্রতিফলন বাস্তবায়ন না হওয়া ৩৩
৬.৩.৪ জনগণের কাছে প্রত্যক্ষ জবাবদিহিতার অভাব ৩৪
৬.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ৩৪
৬.৪.১ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের প্রভাব ৩৪
৬.৪.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ৩৪
৬.৪.৩ দলীয় রাজনীতির প্রভাব ৩৪
৬.৪.৪ স্থানীয় প্রশাসনের প্রভাব ৩৪
৬.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ঘাটতি ৩৪
৬.৬ সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান শক্তিশালীকরণ ৩৫
৬.৭ উপসংহার ৩৫

অধ্যায় সাত
উপসংহার ও সুপারিশ **৩৬**
৭.১ উপসংহার ৩৬
৭.২ স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ৩৬
৭.২.১ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ৩৬
৭.২.২ রাজনৈতিক দলীয়করণ ৩৭
৭.২.৩ সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি ৩৭
৭.২.৪ দীর্ঘসূত্রতা ৩৭
৭.২.৫ নীতিমালা ও বিধিমালার ঘাটতি ৩৭
৭.২.৬ আইন, বিধিমালার প্রয়োগের ঘাটতি ৩৭
৭.২.৭ আর্থিক সক্ষমতার অভাব ৩৭
৭.২.৮ জনবল ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ৩৭
৭.২.৯ তদারকির ঘাটতি ৩৮
৭.২.১০ সমন্বয়ের অভাব ৩৮
৭.২.১১ অপর্যাপ্ত ভাতা ৩৮
৭.২.১২ দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনা ৩৮
৭.২.১৩ জনসচেতনতার অভাব ৩৮
৭.৩ স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব ৩৮
৭.৩.১ দুর্বল স্থানীয় সরকার ৩৮
৭.৩.২ প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন না হওয়া ৩৮
৭.৩.৩ কাজ টেকসই না হওয়া ৩৯
৭.৩.৪ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন না হওয়া ৩৯
৭.৩.৫ দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ৩৯
৭.৪ সুপারিশ ৩৯

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী **৪১**

পরিশিষ্ট **৪২**
পরিশিষ্ট ১: কেস স্টাডি - এলজিএসপি ৪২
পরিশিষ্ট ২: কেস স্টাডি - আরবান পার্টনারশিপ ফর পভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর) ৪৩
পরিশিষ্ট ৩: দরপত্র নিয়ন্ত্রণ ৪৪
পরিশিষ্ট ৪: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়ের উৎস ৪৫
পরিশিষ্ট ৫: স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ৪৬

সারণির তালিকা

সারণি ২.১: স্থানীয় সরকার খাতের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ০৭
সারণি ৩.১: ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান/ মেয়র এবং সদস্য/ কাউন্সিলর এর সম্মানী (টাকা) ১৩
সারণি ৬.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয়ে কেন্দ্রিয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা (শতাংশ) ৩২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: স্থানীয় সরকার খাতের কাঠামো ০৭
চিত্র ৩.১: জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের হার (%) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর) ১৪
চিত্র ৪.১: দরপত্র প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির ধরন ২১
চিত্র ৬.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণে সীমাবদ্ধতা ৩৩
চিত্র ৭.১: স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ৩৯

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি'র অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত তিনটি খাতের একটি হচ্ছে স্থানীয় সরকার খাত। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পর্যায়ে এ খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে টিআইবি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ খাতে উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা, সরকারি ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র প্রকাশিত হয়। তবে স্থানীয় সরকার খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে সার্বিকভাবে এ খাতের বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক মো. রবিউল ইসলাম, নাহিদ শারমীন ও ফারহানা রহমানের নেতৃত্বে এ গবেষণা পরিচালিত হয়। সার্বিকভাবে গবেষণার তত্ত্বাবধান করেছেন শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল, যার ফলে তাদের থেকে মূল্যবান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। টিআইবি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ স্থানীয় সরকার খাতের সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে, এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার খাতের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলত স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যেখানে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের[১] স্থানীয় শাসনের ভার দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।[২] নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কাজ, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনসাধারণের কাজ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করাসহ বাজেট প্রস্তুত, নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে বলেও সংবিধানে অঙ্গীকার করা হয়েছে।[৩]

নবম ও দশম সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহারে[৪] ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ভৌগোলিক বিবেচনায় তিন ভাগে বিভক্ত - গ্রামীণ, নগরকেন্দ্রিক ও বিশেষ এলাকার স্থানীয় সরকার। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে ইউনিয়ন স্তরে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা স্তরে উপজেলা পরিষদ, জেলা স্তরে জেলা পরিষদ, এবং নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য তিনটি জেলাকে বিশেষ এলাকা হিসেবে বিবেচনা করে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ[৫] এবং একটি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ইউনিয়ন পর্যায় ছাড়া অন্য স্তরগুলোতে বিদ্যমান।

শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানকারী খাতসমূহের মধ্যে স্থানীয় সরকার অন্যতম। এই খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা/ অধিদপ্তরগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা স্থানীয় উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতের স্থানীয় সরকার বিভাগে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ২২০ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের ৬.৯৮ শতাংশ[৬] এবং জিডিপি'র[৭] ১.২৭ শতাংশ। বাজেটে অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, ত্রাণ ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার প্রশ্নবিদ্ধ কারণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার খাতের দুর্নীতি ও অনিয়ম, ও আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। গণমাধ্যমে এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত গবেষণাসহ বিভিন্ন প্রতিবেদনে এ সকল তথ্য উঠে এসেছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্থানীয় সরকার খাতের দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে, যেমন টিআর/কাবিখার তহবিল নিয়ে জনপ্রতিনিধির অনিয়ম-দুর্নীতি, আত্মসাৎ, দরপত্রে দুর্নীতি ইত্যাদি।[৮]

---

[১] ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক অংশ

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯(১)।

[৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯(২), ৬০।

[৪] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০০৮, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ*। ইশতেহারে বলা হয়, 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে। জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলা হবে' (প্যারা ৬); এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১৩, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ*। ইশতেহারে বলা হয়, কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর গণতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কাছে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হবে (আমাদের এবারের অগ্রাধিকার: সুশাসন, গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, ১.৭)।

[৫] রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি।

[৬] ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ১,৮৯,৩২৬ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ভারতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতের বরাদ্দ ছিল ১১.৭% (সূত্র: Union Budget, 2013-2014-http://indiabudget.nic.in/budget2013-2014/ub2013-14/bag/bag2013.pdf, ২৫ এপ্রিল ২০১৪) ও নেপালে ৯% (National budget, Government of Nepal, Ministry of Finance 2014-http://www.mof.gov.np/uploads/cmsfiles/file/English_complete(1)_20130729034813.pdf, ২৫ এপ্রিল ২০১৪)।

[৭] চলতি বাজারমূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ১০,৩৭,৯৮৭ কোটি টাকা (সূত্র: *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*)।

[৮] উদাহরণ হিসেবে দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, 'ওয়াসা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে দুদক', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২; 'বড় বাজেটের কাজ হচ্ছে সমঝোতার মাধ্যমে', ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২; 'টিআরের নামে ত্রিমুখী প্রতারণা', ১১ নভেম্বর ২০১১; 'ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ', ২০ জুন ২০১১;

২০১১-১২ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে ১৮৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার মধ্যে দরপত্রে অনিয়ম, দাপ্তরিক দুর্নীতি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি (আত্মসাৎ), বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি, উন্নয়নমূলক কাজের মন্থরগতি ইত্যাদি (এলজিইডি ২০১২: ১৬)। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর একটি গবেষণা (মাহমুদ ২০০৬) অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দুর্নীতির শীর্ষে ছিল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মোট আর্থিক দুর্নীতির ৩৯.৫%)।[৯] আবার ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে (টিআইবি ২০১২) ৪৭.৬% খানা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা নেয়, এবং এসব খানার ৩০.৯% (গ্রামাঞ্চলের ৩৪.৫% ও শহরাঞ্চলের ২৪.৭%) এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকালে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়। এ জরিপ অনুযায়ী স্থানীয় সরকার খাতে সেবা নিতে গিয়ে মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের পরিমাণ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত হয় ১৫০.২ কোটি টাকা।

টিআইবি এ পর্যন্ত এ খাতের ওপর বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন ও প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর বেইজলাইন ও রিপোর্ট কার্ড জরিপ,[১০] জাতীয় খানা জরিপ[১১] এবং সরকারি সংস্থার[১২] ওপর বিস্তারিত গবেষণা। এসব গবেষণার মধ্যে জাতীয় খানা জরিপে এ খাতে খানা পর্যায়ে সেবা বিষয়ক দুর্নীতির সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকারি সংস্থার ওপর পরিচালিত অন্যান্য গবেষণাতেও অনিয়ম ও দুর্নীতির উপস্থিতি এবং সার্বিকভাবে সুশাসনের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। সার্বিকভাবে এ খাতের ওপর ইতিহাস সংক্রান্ত (সিদ্দিকী ১৯৯৯), বিভিন্ন সেবা যেমন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির সুশাসন বিষয়ক (পিপিআরসি ২০১২), আর্থিক সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত, আয়-ব্যয়, বাজেট সংক্রান্ত (চৌধুরি ২০০৫; এডিবি ২০০৫; ভট্টাচার্য ২০১৩), বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন (আহমেদ ১৯৯৯; তালুকদার ২০১৩; পান্ডে ২০১১) এবং উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ (কেয়ার ২০১২) বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে, কিন্তু সার্বিকভাবে স্থানীয় সরকার খাতের ওপর সুশাসন বিষয়ক গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। টিআইবি'র কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, এবং এ খাতের ওপর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- স্থানীয় সরকার খাতের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এবং
- এ খাতের দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন ও তার কারণ নিরূপণ করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় স্থানীয় সরকার খাত বলতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে সরকারি সংস্থা এবং পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া যেহেতু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ত্রাণ ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির কিছু কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবায়ন করে সেহেতু এসব কার্যক্রমও এ খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষণায় স্থানীয় সরকার খাতের সুশাসনের সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (বিশেষ এলাকার তিনটি জেলা পরিষদ বাদে অন্যান্য জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) ও খাত-সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা/ অধিদপ্তর/ দপ্তরের সুশাসনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বরাদ্দ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (জনবল ব্যবস্থাপনা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, বেতন-ভাতা, সক্ষমতা) অবকাঠামো, লজিস্টিকস ব্যবহার, তথ্যের উন্মুক্ততা, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, লজিস্টিকস ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয়

'মিরসরাইয়ে টিআর প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ', ১২ অক্টোবর ২০১১; *ডেইলি স্টার*, 'অ্যাসল্ট অন দশমিনা ইউজেড ভাইস-চেয়ারম্যান', ৩০ জুলাই ২০১০; *দৈনিক সংবাদ*, 'কেশবপুরে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কাবিখা ও টিআরের চাল আত্মসাতের অভিযোগ', ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২; 'অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ: ছাতকে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু', ২ ফেব্রুয়ারি ২০১২; *দৈনিক সংগ্রাম*, 'গাইবান্ধা পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ', ১৪ নভেম্বর ২০১১; *বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম*, 'তালতলীর ইউএনওর বিরুদ্ধে দরপত্র দুর্নীতির অভিযোগ', ১৭ নভেম্বর ২০১৩।

[৯] এই প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ছিল ৫২৬ কোটি ২৭ লাখ ২৪ হাজার ৫১৫ টাকা, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ ২০৮ কোটি ৯ লাখ ১৭ হাজার ২৫২ টাকা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাহমুদ (২০০৬)।

[১০] ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪৫টি সচেতন নাগরিক কমিটি এলাকায় (৪৩টি জেলায় বিস্তৃত; ৩৮টি জেলা সদর ও ৭টি উপজেলায় অবস্থিত) নির্দিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর ৫৪টি বেইজলাইন জরিপ ও ৬৪টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ করা হয়। রিপোর্ট কার্ড জরিপ ও বেইজলাইন জরিপে এসব প্রতিষ্ঠানের সেবার মান ও সেবগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর পাশাপাশি প্রশাসনিক সমস্যা নিয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

[১১] জাতীয় খানা জরিপ ২০০৫, ২০০৭, ২০১০ ও ২০১২-তে জরিপের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

[১২] উপজেলা পরিষদ (২০১১) ও জেলা পরিষদের (২০১৪) সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও কার্যকরতা নিয়ে দুইটি কার্যপত্র, চট্টগ্রাম ওয়াসার ওপর একটি রিপোর্ট কার্ড (২০০৭) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০১৩) নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে।

সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত তথ্য, যেমন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, কাবিখা প্রভৃতি) এবং অন্যান্য সেবায় (বিভিন্ন সনদ, বিচার ও সালিশ, ট্রেড লাইসেন্স, পানি পরিসেবা, ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, হোল্ডিং কর) দুর্নীতি ও অনিয়ম পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন নির্বাচন, জবাবদিহিতা, আর্থিক সক্ষমতা এবং স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে আইনি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণা মূলত গুণগত ও পরোক্ষ তথ্যভিত্তিক, যেখানে কোনো কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক উৎস হতেও নতুন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং বিভিন্ন ধরনের গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল যেমন সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া সাক্ষাৎকার ও পরোক্ষ তথ্য ব্যবহার করে গ্রাম এবং শহরকেন্দ্রিক বড় দুইটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়নকে কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[১৩]

১.৪.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: গবেষণায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহের তথ্য প্রাথমিক ও পরোক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি[১৪], প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, বাজেট, স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক প্রতিবেদন, কার্যাবলী, বিভিন্ন ধরনের ম্যানুয়ালসহ অন্যান্য প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র, নির্দেশনা, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, টিআইবি'র গবেষণা[১৫] এবং গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত সংবাদ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত চেকলিস্ট ব্যবহার করে উপরিউক্ত পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কী কী তথ্য প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে পরোক্ষ তথ্যের সত্যতা যাচাই এবং নতুন তথ্যের জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে **১২**টি বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (খুলনা জেলার পাঁচটি, বরিশাল জেলার দু'টি এবং ঢাকা, রংপুর, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া জেলার প্রত্যেকটি হতে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) ওপর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিসহ **৫১** জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এছাড়া টিআইবি পরিচালিত সিটি কর্পোরেশনের ওপর চলমান গবেষণার জন্য **১৩১** জনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক তথ্যের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় সরকার কমিশনের (বিলুপ্ত) সদস্য, ঠিকাদার এবং সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষণ: গবেষণায় বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভবনগুলোর মালিকেরা কিভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং দালালের সংস্পর্শে আসে, কর নির্ধারণ, আপিল এবং কর প্রদানের সময় কী ধরনের বাধা ও হয়রানির সম্মুখীন হয়; ট্রেড লাইসেন্স আবেদনকারীরা কিভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং দালালদের সাথে যোগাযোগ করে, নতুন লাইসেন্স করা বা নবায়নের সময় কী ধরনের বাধা ও হয়রানির সম্মুখীন হয়; টেন্ডার প্রদানে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং অন্যান্য সেবা এবং তথ্যের উন্মুক্ততায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

---

[১৩] প্রকল্প দুটি হল স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প-২ (এলজিএসপি-২) যার মোট বরাদ্দ ৫৩৪.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আরবান পার্টনারশিপ ফর পভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর) যার মোট বরাদ্দ ৬৭ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড।

[১৪] এই গবেষণায় স্থানীয় *সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; জেলা পরিষদ আইন ২০০০; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯; উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১; সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮; পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০; উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৩; ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০; সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধি, ১৯৮২; সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮* ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[১৫] এসব গবেষণার মধ্যে রয়েছে জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ (৬৪টি জেলার ৩৫০টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা সংক্রান্ত তথ্য), ৪৩টি জেলায় বেইজলাইন জরিপ (৫৫টি), রিপোর্ট কার্ড জরিপ (৬৪টি), কার্যপত্র (উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ), এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওপর গবেষণা।

১.৫ তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ

এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকার করার জন্য টিআইবি'র গবেষকেরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল। মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং এসব তথ্য কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয়। এছাড়া পরোক্ষ তথ্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১.৬ গবেষণার সময়

২০১৩ এর ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ২০১৪ এর মে পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থার কার্যক্রম এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যার ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

১.৮ প্রতিবেদনের কাঠামো

এই প্রতিবেদনে সাতটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার খাতের বিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কার্যাবলী এবং এর উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার খাতের প্রশাসনিক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকস ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, বাজেট প্রস্তুতি ও বরাদ্দের বিতরণ, তথ্যের উন্মুক্ততা, আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, এবং অবকাঠামোগত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের চিত্র এবং ক্রয় প্রক্রিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার সেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদনে সমস্যা এবং অনিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে নির্বাচন, আর্থিক সক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার খাতের বিরাজমান সমস্যার কারণ ও প্রভাব, এবং এসব সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় দুই

স্থানীয় সরকার খাতঃ বিবর্তন, কাঠামো, কার্যাবলী ও অর্জন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার খাতের কার্যক্রম পর্যালোচনার আগে এই খাতের বিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কার্যাবলী এবং অর্জন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ স্থানীয় সরকার খাতের বিবর্তন

বিবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ঔপনিবেশিক, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ আমলঃ ঔপনিবেশিক আমলের পূর্ব থেকেই সামাজিক চাহিদার তাগিদে স্থানীয় পর্যায়ের বয়স্ক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চায়েত ছিল। এলাকার উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ নানা ধরনের কার্যাবলী সম্পন্ন করা ছিল পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য। তবে এই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনগত ভিত্তি ছিল না। পরর্তীতে ১৮৭০ সালে ব্রিটিশ চৌকিদারি আইন পাশ করা হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন এবং প্রতিটি ইউনিয়নে চৌকিদারি পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে তিন বছরের জন্য প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল। এই পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চৌকদার নিয়োগ করা। তারা কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল না (রহমান ২০০০)। পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নতি সাধনের জন্য ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট পাশ করা হয়েছিল। এই আইন অনুযায়ী তিন স্তরবিশিষ্ট গ্রাম স্বায়ত্তশাসিত সরকার, যথা জেলা পর্যায়ের জন্য জেলা বোর্ড, মহকুমা পর্যায়ের লোকাল বোর্ড এবং গ্রাম এলাকার জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এছাড়া শহর এলাকায় উন্নতি সাধনের জন্য ১৮৮৪ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পাশ করা হয়েছিল এবং এ আইন অনুযায়ী শহর এলাকায় পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে স্থানীয় শাসনকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন কমিটি এবং কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কমিটিগুলোর মধ্যে ১৯০৭-০৯ সালের হব হাউস কমিশন, ১৯১৩-১৪ সালের লিভিঞ্জ কমিটি ছিল উল্লেখযোগ্য, কারণ তাদের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলার আইনসভায় 'গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইন ১৯১৯' প্রণীত হয়। এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে দুই স্তরবিশিষ্ট (ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা বোর্ড) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল (রহমান ২০০০)।

পাকিস্তান আমলঃ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রেক্ষিতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ৫৬টি মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ড গঠিত হয়, যার মোট সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত এবং এক-চতুর্থাংশ বাছাইয়ের মাধ্যমে মনোনীত ছিল। ১৯৫০ সালে মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট পাশ হয়। এই অ্যাক্টের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটি বোর্ডকে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে রূপান্তর করা হয়। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল গঠিত হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিল ১০ থেকে ১৫ জন সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলে তিনভাগের দুইভাগ সদস্য নির্বাচিত এবং একভাগ সদস্য মনোনীত ছিল। জেলা প্রশাসকের সম্মতিক্রমে মহকুমা প্রশাসক সদস্যদের মনোনীত করতেন। কিন্তু মনোনয়ন পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনার কারণে ১৯৬২ সালে এ পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছিল। কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণসহ ৩৭ ধরনের কাজ ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেওয়া হয়েছিল। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং থানার সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে থানা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। থানা এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ছিল থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ। জেলা কাউন্সিল ছিল নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের দ্বারা গঠিত। নির্বাচিত সদস্যরা ছিল ইউনিয়ন ও টাউন কমিটির সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যরা ছিল সরকার দ্বারা মনোনীত। এছাড়া জেলার ডেপুটি কমিশনারকে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হত। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয় নির্মাণ, হাসপাতাল নির্মাণ, স্যানিটেশনসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা ছিল জেলা কাউন্সিলের কাজ। সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠন করে বিভাগীয় কমিশনারকে বিভাগীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল বিভাগীয় কাউন্সিলের কাজ।

বাংলাদেশ আমলঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সংবিধানে স্থানীয় শাসনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, এবং স্থানীয় শাসনের ভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রদান করার কথা বলা হয়। ১৯৭২ সালে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিলকে পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত, থানা কাউন্সিলকে পরিবর্তন করে থানা উন্নয়ন কমিটি এবং ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলকে পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড, টাউন কমিটিকে 'শহর কমিটি' এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি'কে পৌরসভায় রূপান্তর করা।

১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত করার জন্য 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুসারে গ্রাম এলাকার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং শহর এলাকার জন্য পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা হয়, এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি বিলুপ্ত করা হয়। এছাড়া দুইজন মনোনীত নারী সদস্য এবং দুইজন প্রতিনিধি সদস্য (কৃষকের মধ্য থেকে) ইউনিয়ন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন চেয়ারম্যান ও নয়জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মনোনীত নারী সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। ২০০৯ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ পাশ করা হয়। ২০০৩ সালে সরকার 'গ্রাম সরকার আইন ২০০৩' পাশ করা হয়, এবং তা ২০০৯ সালে রহিত করা হয়।

১৯৮২ সালের ২৩ ডিসেম্বর 'উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ' জারির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় যা ঐ বছরের ৭ নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়।[১৬] ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন সরকার উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করে।[১৭] ১৯৯৬ সালে নবগঠিত সরকার উপজেলা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য আট সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করে এবং 'উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮' প্রণয়ন করে। প্রথম মেয়াদে উপজেলা নির্বাচন ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে, এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ১৯৯০ সালের ১৪ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালে সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আবার 'উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮' জারি[১৮] করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ২০০৯ এর ২২ জানুয়ারি নির্দিষ্ট করে তফসিল ঘোষণা করা হয়, এবং সে অনুযায়ী দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৮ সালের স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাশ হয়। এই আইনের আওতায় তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে অবশিষ্ট ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদ গঠিত হয়। ২০০০ সনের ৬ জুলাই জেলা পরিষদ সংক্রান্ত আইন রহিত করে সংশোধনসহ জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ পাশ করা হয়। এই আইনের ওপর ভিত্তি করে ২০১১ সালে ৬১টি জেলায় জেলা পরিষদ প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালে 'পৌরসভা অধ্যাদেশ' জারি হয়। ১৯৯৮ সালে এবং ২০০৮ সালে ১৯৭৭ সালের 'পৌরসভা অধ্যাদেশ' এর কিছু পরিবর্তন করা হয়। ২০০৮ সালে 'পৌরসভা অধ্যাদেশ' অনুযায়ী প্রতিটি ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর এবং মোট ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ওয়ার্ড গঠন ও প্রতিটি সংরক্ষিত ওয়ার্ড থেকে একজন নারী কাউন্সিলর সরাসরি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের ভোটে নির্বাচিত হয়। ২০০৯ সালে ২০০৮ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে সরকার স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে ২০০৯ সালের আইনের চারটি ধারা সংশোধন করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০১০ কার্যকর করা হয়।

১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশন, ১৯৮৩ সালে ঢাকা পৌর কর্পোরেশন, ১৯৮৪ সালে খুলনা পৌর কর্পোরেশন এবং ১৯৮৬ সালে রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন অধ্যাদেশ জারি করা হয় (পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশনে পরিণত) এবং সরাসরি নির্বাচনের নিয়ম রেখে ১৯৯৩ সালে আইন প্রণীত হয়। ২০০৯ সালে সরকার সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ পাশ করে এবং পূর্বের পৃথক সিটি কর্পোরেশনের জন্য গৃহীত পৃথক আইন রহিত করে। পরবর্তীতে ২০১১ সালে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনকল্পে বিল পাশ করে যার মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত হয়।

২.২ স্থানীয় সরকার খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে গ্রামীণ ও নগরকেন্দ্রিক এই দুইভাগে বিভক্ত। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার তিন স্তরবিশিষ্ট যার মধ্যে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ (৪,৫৫৮টি), উপজেলা পরিষদ (৪৮৭টি) ও জেলা পরিষদ (৬৪টি)। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের যার মধ্যে রয়েছে পৌরসভা (৩১৯টি) ও সিটি কর্পোরেশন (১১টি)।[১৯] বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের একটি পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ। এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ বাদে) কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য আটটি সহযোগী সংস্থা[২০] স্থানীয় সরকার,

---

[১৬] *Local Government (Thana Parishad and Thana Administration Reorganization) Ordinance 1982* (Ordinance No. LIX of 1982)।

[১৭] *স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন বাতিল) অধ্যাদেশ ১৯৯১*।

[১৮] ৩০ জুন ২০০৮।

[১৯] স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

[২০] এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চারটি ওয়াসা (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী), জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও মশক নিবারণী দপ্তর।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে কাজ করে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিত্র ২.১: স্থানীয় সরকার খাতের কাঠামো

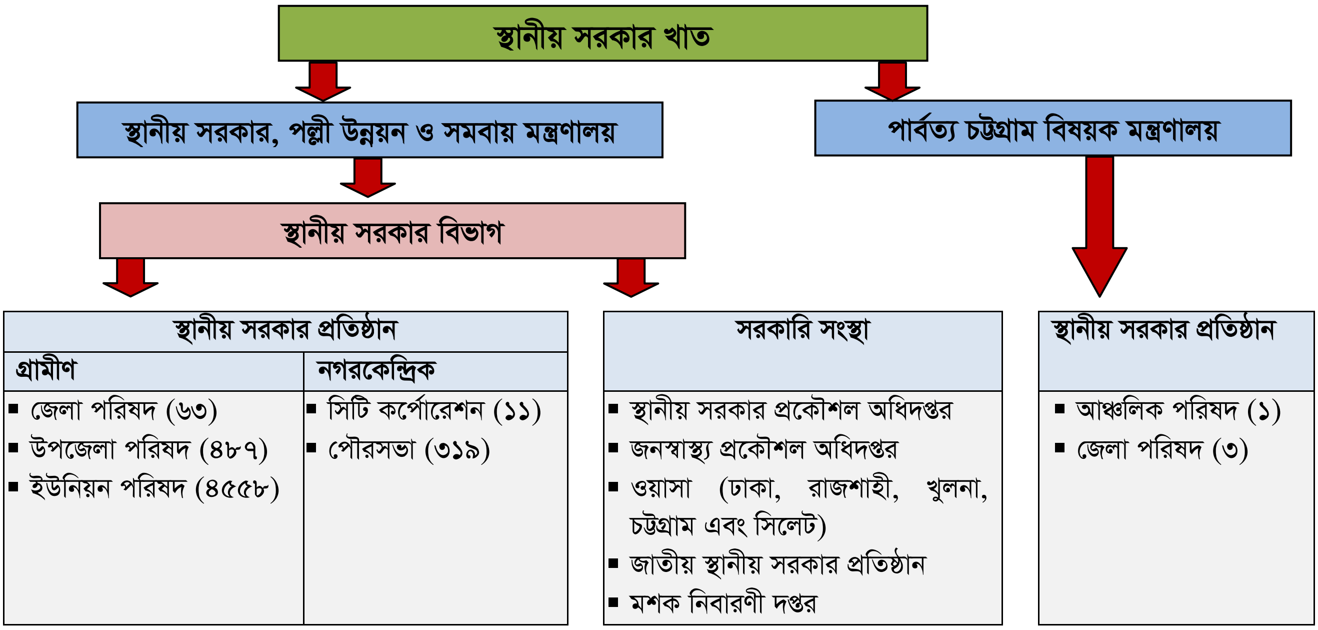

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। এ বিভাগের অধীনে পাঁচটি অনুবিভাগ রয়েছে: অতিরিক্ত সচিবের অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সরবরাহ অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, মনিটরিং, ইন্সপেকশন ও ইভ্যালুয়েশন অনুবিভাগ। এ বিভাগের আওতায় বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, দপ্তর/ অধিদপ্তর এবং তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল রয়েছে।

২.৩ স্থানীয় সরকার খাতের কার্যাবলী

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থানীয় সরকার খাতের বিভিন্ন অধিদপ্তর/ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং বরাদ্দ বিতরণে স্থানীয় সরকার বিভাগ বা সচিবালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে কাজগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল:

সারণি ২.১: স্থানীয় সরকার খাতের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা

উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
১. স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুশাসন জোরদারকরণ	স্থানীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ও অর্থ ছাড়	সচিবালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
	নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সংশিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
	স্থানীয় সরকার বিষয়ে গবেষণা	জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
	উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
২. গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টার, নারীদের জন্য বাজার সেকশন এবং ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
৩. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নারী শ্রমিক নিয়োগ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
	এল-সিএস নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সচিবালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান
৪. সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান	টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা, উন্নয়ন ও প্রয়োগ, পানি, স্যানিটেশন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ উন্নয়ন, পানির উৎসের গুণগত মান পরীক্ষাকরণ ও নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, নিরাপদ পানি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
	পরিবেশবান্ধব ইকো টয়লেট নির্মাণ, নিরাপদ পানির উৎস ও পানি সরবরাহের অবকাঠামো নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ব্যবহার এবং আর্সেনিক বিষয়ে সচেতনকরণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ওয়াসা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
৫. দরিদ্র ও বস্তিবাসীদের জীবন যাত্রার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন	শহরের দরিদ্র মা ও শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও মাতৃসদন নির্মাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	সচিবালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
	শহরের বস্তিবাসী ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য মৌলিক অবকাঠামো সহায়তা প্রদান, বস্তি এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন, পরিবেশ বান্ধব স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	ওয়াসা সিটি কর্পোরেশন
	স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে বস্তিবাসীদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা/ প্রতিষেধক প্রদান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৬. বাধ্যতামূলকভাবে জন্ম নিবন্ধীকরণ নিশ্চিতকরণ	জন্ম নিবন্ধন কাজে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, জন্ম তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধীকরণ	সচিবালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
৭. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সম্পৃক্তকরণ, স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ, হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা
৮. ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের ব্যবহার, সম্প্রসারণ ও সুষম বন্টন	পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য খাল খনন/ পুনঃখনন, পানি সংরক্ষণের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ, বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য রেগুলেটর, ক্রস-ড্যাম, বাঁধ নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৯. পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিতকরণ	শহর এলাকায় রাস্তা, ফুটপাত, ড্রেন, বাতি, বাস/ ট্রাক টার্মিনাল, যানবাহন পার্কিং জায়গা নির্ধারণ, পাইকারি ও খুচরা বাজার নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কমিউনিটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা
১০. বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান	নাগরিক, জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু সনদ, ওয়ারিশ সনদ, চারিত্রিক সনদ, প্রত্যয়নপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সনদপত্র প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ বিতরণ, বিচার ও সালিশ সম্পাদন, ট্রেড লাইসেন্স প্রদান	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

২.৪ স্থানীয় সরকার খাতের অর্জন

দেশের ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার খাতের বিভিন্ন অধিদপ্তর/ সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তাই এইসব দপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাফল্য স্থানীয় সরকার খাতের অর্জন হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে সর্বমোট ৫,৪৩৯টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিষদ গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫,৩৭৩টি (৯৮.৭৮%) প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রয়েছে। নিচে স্থানীয় সরকার খাতের কিছু অর্জন[২১] তুলে ধরা হল-

[২১] এই সকল অর্জন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত ও প্রকাশিত, যার অধিকাংশ পাওয়া যাবে http://www.lgd.gov.bd/images/pdf/download/lgd/four%20yrs%20achievment.pdf (accessed on 12 Febrruary 2014)

অবকাঠামো নির্মাণ

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৮২,০৫৭ কি.মি. রাস্তা নির্মাণ, যার মধ্যে উপজেলা রাস্তা ৩০,২৭০ কি.মি., ইউনিয়ন রাস্তা ৪৪,৭৫১ কি.মি. এবং গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ২৯,৪৪২ কি.মি.; এবং এসব রাস্তায় ১,১৫৮ কি.মি. (বা ১১,৫৭,৮৯৯ মিটার) সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ;[২২] ১,৭৫৯টি গ্রোথ সেন্টার, ১,৬৬৭টি গ্রামীণ হাট-বাজার নির্মাণ ও উন্নয়ন, ২১,৪৩০ কি.মি. সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৪২৬টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ; এছাড়া, ১২৫৮৩ কিমি সড়ক এবং ১০.৭৪ কিমি সেতু/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে (১৯৯২ থেকে ২০১২ এর মে পর্যন্ত)।
- পৌর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে ৮০৪ কিমি সড়ক, ১,৮১২ মিটার সেতু/ কালভার্ট, ৬৬৭ কিমি ড্রেন, ৯টি বাস টার্মিনাল নির্মাণ এবং ২,১৮২ কিমি সড়ক এবং ৭৫১ মিটার সেতু/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সড়ক, সেতু/ কালভার্ট, ড্রেন, ফ্লাইওভার, ফুটওভার ব্রিজ ও ফুটপাত নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে।

ক্ষমতায়ন

- দুস্থ ও গরিব নারী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রায় সবগুলো পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন গ্রোথ সেন্টার/ হাট-বাজারে নারী বাজার শাখা নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে নারীদের জন্য আলাদা দোকানের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- এলজিইডি'র ১৯৯২- ২০১২ সালে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৬৭৪২ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি এবং ২০০৯-২০১২ মেয়াদকালে প্রতি বছর ৯৮,২৪০ জন দুস্থ নারীর বছরব্যাপী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইসাথে এদের স্ব-উদ্যোক্তা হিসেবে স্ব-নির্ভর হওয়ার জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচিতে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে।

কমিউনিটি উন্নয়ন

- প্রায় ৩,০০০ গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রায় ৯০,০০০ পরিবারকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দুইটি প্রকল্প, রাজশাহী বিভাগের জন্য সমতল আদিবাসীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প এবং ঢাকা-সিলেট বিভাগের জন্য বন ভিত্তিক আদিবাসীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রদান

- জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৪১,৩৭০ জনকে অফিস ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের ১৩৩টি পৌরসভায় ডিজিটাল পৌরসভা মাস্টার প্ল্যান, কর ব্যবস্থাপনা, ট্রেড লাইসেন্স হিসাব পদ্ধতি, পানির বিল ইত্যাদি বিষয়ে সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার

- সারাদেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।
- এলজিইডিতে জিআইএস (GIS) ম্যাপিং, পরিসংখ্যাপত্র (Inventory) এবং সফটওয়্যারের ব্যবহার আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এছাড়া একই প্রতিষ্ঠানে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের অনলাইন পরিবীক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ দানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- অন-লাইন জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট জনসন্মুখে প্রকাশ হওয়ার পদক্ষেপ বেড়েছে।
- বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহে নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৫ উপসংহার

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তন, স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমল থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থানে এসেছে। এছাড়া এর কার্যাবলী এবং অর্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, স্থানীয় সরকার খাত স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[২২] এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ৫ মে ২০১৩।

অধ্যায় তিন

প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সরকারি সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে। এসব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, জনবল, আইনানুগ জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি), নিয়মিত পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন, পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ প্রাপ্তি, তথ্যের উন্মুক্ততা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি, সমন্বয় কমিটি গঠন এবং এর কার্যকর প্রয়োগ প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে এসব বিষয়ের ওপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাগুলোর অবকাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অধিদপ্তর/ সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা বিরাজমান। এর মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, স্থায়ী কমিটি, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, লজিস্টিকসের পর্যাপ্ততা ও এর ব্যবহার, বাজেট প্রস্তুতি ও বরাদ্দের বিতরণ তথ্যের উন্মুক্ততা সংক্রান্ত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা, আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং আন্তঃসমন্বয় সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম।

৩.১.১ আইন ও বিধি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা, ব্যয়ের হিসাব, নির্মাণ কাজ কার দ্বারা সম্পন্ন করা হবে - এ সবকিছুই সরকার বিধান দ্বারা নির্ধারণ করবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়। পরিষদের কার্যকলাপের নির্দেশ দান, সামঞ্জস্য বিধান, বাতিল, স্থগিতের জন্য সরকার পরিষদের ওপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক ও পূর্ত কার্যক্রমে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিচালনায় সরকারের পূর্ব অনুমোদনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার এবং আবার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সম্পত্তির হস্তান্তর করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে রয়েছে।[২৩]

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী পরিষদের কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের জন্য যদি পরিষদের কোনো অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় ও অপপ্রয়োগ করা হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নয় বরং সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে।[২৪]

এছাড়া উপজেলা পরিষদ আইন ২০১১ এবং জেলা পরিষদ আইন ২০০০ অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করার কথা।[২৫] তথ্যদাতাদের মতে, উপদেশ নয় বরং তাদের পরামর্শ শুনতে পরিষদ বাধ্য। এমনকি পরিষদের প্রত্যেকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যের পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংসদ সদস্যের ওপর নির্ভর করতে হয় (রহমান ও শারমীন ২০১১; আকরাম ২০১৩; শারমীন ও আকরাম ২০১৩; শারমীন ২০১৪)। এছাড়া পরামর্শ গ্রহণের বিধানের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখা হয়েছে।

দেখা যায় ১৯৯৮ সালের আইনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হয়েছিল, যা পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ দুর্বল হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮-তে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল,[২৬] যা উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১-তে পরিবর্তন করে সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।[২৭] এছাড়া এ আইনে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা

[২৩] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৩৬, ২৮, ৫৭, ৫৮ ও ২৯; *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৪৪, ৬০, ৮৫; *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৬০, ৮০, ৯৯, ১০১, ১০৫; *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫১, ৫২, ৫৫(৩), ৭৩; *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন*, ২০১১, ধারা ৪১।

[২৪] *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, ধারা ১০৫(২), স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৮৭; *জেলা পরিষদ আইন* ২০০০, ধারা ৫০; *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৭৪।

[২৫] *উপজেলা পরিষদ আইন*, *১৯৯৮*, ধারা ২৫ *এবং জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৩০।

[২৬] *উপজেলা পরিষদ আইন*, *১৯৯৮*, ধারা ৩৩।

[২৭] *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন*, *২০১১*, ধারা ৩৩।

চেয়ারম্যানের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে,[২৮] যেখানে পূর্বতন আইনে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কেউ পালন করতে পারত।[২৯]

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন) নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধিমালা না থাকায়, নারী সদস্যরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পায় না। ফলে নারী সদস্যরা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না (টিআইবি ২০০৯ ও ২০১১; আলম ২০১২; হোসেন ২০১২; রহমান ২০১১; রহমান ২০১২)।

স্থায়ী কমিটির কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধি না থাকার ফলে অনেক সময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থায়ী কমিটি কার্যকর করতে অনীহা প্রকাশ করে।

সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কাজে সহায়তার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে যেখানে পরিষদের সদস্য ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে,[৩০] যা স্থানীয় জনগণকে স্থানীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু পরিষদের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের এসব কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিষয়টি আইনে উল্লেখ নেই।

এছাড়া প্রকল্পের লজিস্টিকস ব্যবহার করার জন্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের কোনো নীতিমালা নেই। এছাড়া প্রকল্পের গাড়ি কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে সরকারি গাড়ি ব্যবহার বিধি, ১৯৮২ তে উল্লেখ নেই (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)।

৩.১.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন করা আবশ্যক।[৩১] তবে এসব স্থায়ী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে স্থায়ী কমিটি গঠন হয় না এবং কার্যকর থাকে না।

৩.১.২.১ স্থায়ী কমিটি গঠন: প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কমিটি গঠনের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে আইনে উল্লিখিত সংখ্যার থেকে কম স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০১১ সালে টিআইবি পরিচালিত বেইজলাইন জরিপে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (১০টি পৌরসভা ও ৩টি ইউনিয়ন পরিষদ) গড়ে নয়টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি এবং পৌরসভায় ১০টি স্থায়ী কমিটি গঠন করার কথা। একইভাবে উপজেলা পরিষদের কাজের সহায়তার জন্য ১৪টি স্থায়ী কমিটি গঠন করার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত অধিকাংশ উপজেলা পরিষদে সবগুলো স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়নি।

৩.১.২.২ অকার্যকর স্থায়ী কমিটি: প্রতিটি পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কমিটি গঠন করা হলেও কিছু স্থায়ী কমিটি কার্যকর থাকে না (মোস্তফা ২০১৩; মোস্তফা ২০১৩, মোস্তফা ২০১৩; হোসেন ২০১২; রহমান ২০১২; আলম ২০১২; মোস্তফা ২০১১; রহমান ২০১১; রহমান ও শারমীন ২০১১; টিআইবি ২০০৯ ও ২০১১)। স্থায়ী কমিটি কার্যকর না থাকার কারণ হিসেবে পরিষদের অনাগ্রহ, বাজেট স্বল্পতা ও পরিবীক্ষণের অভাব উল্লেখযোগ্য। তথ্যদাতাদের মতে ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৭/৮টি সক্রিয় থাকে। এছাড়া স্থায়ী কমিটিতে নারী প্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না।

৩.১.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, পদায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম এবং সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

৩.১.৩.১ জনবলের স্বল্পতা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনবলের স্বল্পতা দুই ধরনের - অনুমোদিত পদের বিপরীতে অপর্যাপ্ত জনবল এবং প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প জনবল। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের মধ্যে অনেক শূন্যপদ রয়েছে। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে জনবলের স্বল্পতা অন্যান্য পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ে প্রকট। এখানে চারটি পদের একটি পদে (হিসাবরক্ষক) এখনো নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং অন্য অনুমোদিত পদের বিপরীতে জনবল

---

[২৮] *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১*, ধারা ২৬ (২)।

[২৯] *উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮*, ধারা ২৬ (২)।

[৩০] *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯*, ধারা ৫০ (৯), ৫৩ (১); *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯*, ধারা ৫৫ (৯); *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৩৪; *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯*, ধারা ৪ (১,২); *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১*, ধারা ২৯ (৪)।

[৩১] *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; জেলা পরিষদ আইন ২০০০, উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১১; স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯*।

শূন্য রয়েছে। পৌরসভায় মোট অনুমোদিত জনবলের প্রায় ৪০% এবং জেলা পরিষদে প্রায় ২০% শূন্য রয়েছে। ফলে দেখা যায়, এতো স্বল্প জনবল দিয়ে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন, তদারকি করা সম্ভব হয় না।

আবার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে[৩২] প্রয়োজনের তুলনায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশনের হিসাব বিভাগে হিসাব সহকারী পদে, রাজস্ব বিভাগে হোল্ডিং কর নির্ধারক, কর সংগ্রহকারী, খতিয়ান খাতায় লেখার জন্য কর্মচারী না থাকার ফলে হিসাব সংরক্ষণ, সঠিক সময়ে কর নির্ধারণ এবং তদারকি করা সম্ভব হয় না। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেটের অধীনে নিয়োগকৃত কর্মীদের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে মামলা চলমান থাকায় কোনো কোনো শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।[৩৩]

৩.১.৩.২ নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার জনবলের নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তথ্যদাতাদের মতে, সিটি কর্পোরেশনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচিত কর্মচারীর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করা হয়। ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশনের (উত্তর ও দক্ষিণ) প্রায় সকল মুখ্য পদগুলো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পূরণ করা হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে পূর্বতন ঢাকা সিটির কর্পোরেশন (ডিসিসি) তার প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দিতে পারলেও তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকত। এখানে উল্লেখ্য, ডিসিসি দুই ভাগ হওয়ার পর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন ও তফসিল ঘোষণা না হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে বন্ধ আছে।

৩.১.৩.৩ পদায়ন সংক্রান্ত অনিয়মঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাগুলোতে কর্মীদের সুবিধাজনক এলাকায় পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ঘুষ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ক্ষমতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান প্রকৌশলীর ইচ্ছার ওপর এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদায়ন নির্ভর করে (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)। অনেক সময় প্রেষণে কোনো পদে যে গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া দরকার তার থেকে উচ্চ গ্রেডের কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ডিসিসি'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী তৃতীয় গ্রেডের কর্মকর্তা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করার কথা, কিন্তু ২০১১ এর নভেম্বর পর্যন্ত ডিসিসিতে দ্বিতীয় গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া ভাগ হওয়ার পরে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ১৯৯০ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা চতুর্থ গ্রেডের পদ হলেও সেখানে তৃতীয় গ্রেডের কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এই পদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বহন করতে হয়। এছাড়া যে সকল পদে (রাজস্ব, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন, স্বাস্থ্য, ভূ-সম্পত্তি, প্রকৌশলসহ প্রভৃতি বিভাগের প্রধান) পদোন্নতি হয়ে বিভাগীয় প্রধান হওয়ার কথা সেখানে সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়, ফলে পদোন্নতি বঞ্চিত কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

৩.১.৩.৪ বদলি সংক্রান্ত অনিয়মঃ সিটি কর্পোরেশন ও সংস্থাগুলোতে কর্মীদের বদলির ক্ষেত্রে তদবির, ঘুষ এবং রাজনৈতিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তথ্যদাতাদের মতে, রাজনৈতিক নেতাদের চাহিদা মেটানোর জন্য কর্মীদের একস্থান হতে অন্যস্থানে বদলি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এলজিইডি'র ক্ষেত্রে কোনো এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী যে সকল কর্মীরা কাজ করতে পারে না তাদের অন্যস্থানে বদলি করা হয়। এছাড়া কোনো কর্মকর্তা যদি রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে তাদের আবার সে এলাকায় বদলি করে আনা হয়। বদলির ক্ষেত্রে অর্থের লেনদেন হয় এবং সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ এ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায় (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)। এছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দুই ভাগ হওয়ার পর কর্মকর্তাদের উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ন্যস্ত করবার সময় অনেকে কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ে তদবির করে, যেখানে ঘুষের লেনদেন হয়েছে।

৩.১.৩.৫ পদোন্নতি সংক্রান্ত অনিয়মঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন) ও সংস্থাগুলোতে কর্মীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানের ক্ষমতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রধানত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর), জেষ্ঠ্যতা নীতি পর্যালোচনার মাধ্যমে পদোন্নতি হওয়ার কথা থাকলেও এলজিইডিতে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

৩.১.৩.৬ সম্মানী ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মঃ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার কাউন্সিলরদের সম্মানী কম। পূর্বে এই সম্মানী আরও কম ছিল। তাই দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে সম্মানী বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় (বর্তমান সম্মানীর পরিমাণ সারণি ৩.১)।

[৩২] পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ

[৩৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।

সারণি ৩.১: ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান/ মেয়র এবং সদস্য/ কাউন্সিলর এর সম্মানী (টাকা)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	শ্রেণি	সম্মানী (টাকা)	
		চেয়ারম্যান/ মেয়র	সদস্য / কাউন্সিলর
ইউনিয়ন পরিষদ	-	৩৫০০	২০০০
পৌরসভা	ক	২০,০০০	৫,০০০
	খ	১৫,০০০	৪,০০০
	গ	১২,০০০	৩,০০০

সম্মানী বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো স্তরে জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরদের সম্মানী ২০০৯ সালের পূর্বে ছিল যথাক্রমে ৫,০০০ এবং ২,০০০ টাকা। ২০০৯ সালে সকল শ্রেণির পৌরসভার মেয়রদের সম্মানী বাড়ানোর জন্য মেয়রদের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দেওয়া হয়, ফলে ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভার মেয়রদের সম্মানী বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২০ হাজার টাকা, ‘খ’ শ্রেণির ১৫ হাজার টাকা এবং ‘গ’ শ্রেণির ১২ হাজার টাকা। কিন্তু সকল শ্রেণির পৌরসভার কাউন্সিলররা ঘুষ না দেওয়ায় তাদের সম্মানী প্রস্তাবিত সম্মানীর তুলনায় বেশি বাড়ানো হয়নি। ‘ক’ শ্রেণির পৌরসভার কাউন্সিলরদের সম্মানী বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫,০০০ টাকা[৩৪], ‘খ’ শ্রেণির ৪,০০০ টাকা এবং ‘গ’ শ্রেণির ৩,০০০ টাকা। এছাড়া প্রস্তাবিত সম্মানী পাওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে উপজেলা স্তরেও ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ আছে।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের মাসিক বেতন ৯,০০০ টাকা, যা তাদের কাজের পরিধি অনুযায়ী কম। প্রতি বছর সরকারি স্কেল অনুসারে বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা কিন্তু এ সংক্রান্ত বোর্ড মাঝে মাঝে দেরিতে (ছয় মাস থেকে এক বছর) বসার কারণে অনেক সময় সুযোগ সুবিধা পেতে দেরি হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শকসহ অন্যান্যদের অফিসের কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য কিংবা পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য মাসিক ভাতা ৬০ টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এ ভাতায় তদারকি কার্যক্রম সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। একটি ওয়ার্ডের সবগুলো হোল্ডিং কেমন অবস্থায় আছে, এলাকায় কারা ব্যবসা করছে, কী ধরনের ব্যবসা আছে ইত্যাদি তদারকি করা সম্ভব হয় না।

৩.১.৩.৭ দক্ষতা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জেলা পরিষদে কোনো কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী এমন রিপোর্ট লিখেন যার সাথে বিষয়বস্তুর কোনো সংগতি থাকে না (শারমীন ২০১৪)। তথ্যদাতাদের মতে, দক্ষ জনবলের অভাবে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তি উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এছাড়া অদক্ষ জনবলের কারণে কখনো কখনো কম কর নির্ধারিত হয়, আবার কখনো কখনো অতিরিক্ত কর নির্ধারিত হয়, এক্ষেত্রে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিধিমালা অনুসরণ করা হয় না। আবার অদক্ষ জনবল হওয়ার কারণে কর পরিশোধের পরেও বকেয়া পরিশোধের নোটিস পায় অনেক হোল্ডিং এর মালিক। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা শহরের জন্য গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপরিউক্ত দক্ষতার অভাব রয়েছে। দক্ষতার ঘাটতির কারণগুলোর মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঠিক ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ঘাটতি উল্লেখযোগ্য।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে কর্মী বাছাইয়ে অনিয়ম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যথাপোযুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় না। দেশের বাইরের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যারা প্রেষণে আসে তারা সাধারণত প্রশিক্ষণ পায়। ফলে স্বল্প সময়ের জন্য প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা অন্যত্র বদলি হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণের সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।

৩.১.৪ বাজেট প্রস্তুতি ও বরাদ্দ বিতরণ

প্রতিটি সরকার এবং রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করলেও, জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতের বরাদ্দের হার কমে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায় (চিত্র ৩.১)। ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ২২০ কোটি টাকা যার মধ্যে সরকারি সংস্থায় (এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ওয়াসা, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, মশক নিবারণী দপ্তর) বরাদ্দ ছিল ১০,৮৫১.৭ কোটি টাকা (৮২.০৮%) এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) বরাদ্দ ছিল ২,৩৬৮.৩ কোটি টাকা (১৭.৯২%)। সরকারি সংস্থার মধ্যে এলজিইডি’র জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬,৮৭৫.৫৮ কোটি টাকা, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে সর্বোচ্চ।[৩৫] এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল (সারণি ৬.১)।

[৩৪] তথ্যদাতার মতে, ’ক’ শ্রেণীর পৌরসভার মেয়রদের প্রস্তাবিত সম্মানী ছিল ৮,০০০ টাকা

[৩৫] বাৎসরিক বাজেট, ২০১৩-২০১৪, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

চিত্র ৩.১: জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দের হার (%) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর)

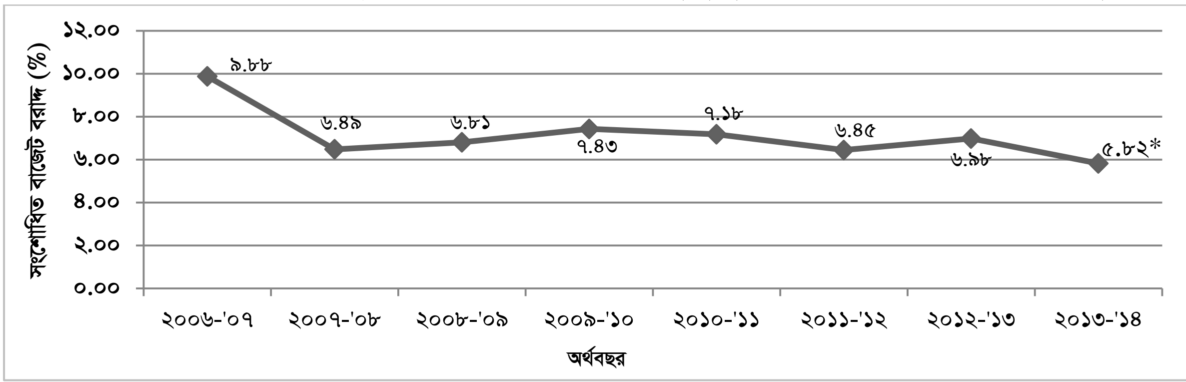

* ২০১৩-'১৪ অর্থবছরের মূল বাজেট বরাদ্দ দেখানো হয়েছে[৩৬]

অন্যদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নিজস্ব আয়ের ক্ষেত্র কম। স্থানীয় আয় থেকে কম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেই ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্র এতটাই কম যে সরকার থেকে বরাদ্দ না পেলে ইউনিয়ন পরিষদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আনুমানিক সূত্রের ভিত্তিতে আগের বছরের সরকারের অনুদান এবং তাদের নিজস্ব অর্থের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করে। পরে বরাদ্দ কম পেলে বাজেট সংশোধন করতে হয়। সংশোধিত বাজেটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কিম গ্রহণ করতে হয়। বাজেট প্রণয়নসহ সংশোধিত বাজেটের অধীনে স্কিম গ্রহণে মেয়র/ চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র আধিপত্য কাজ করে, ফলে মেয়র/ চেয়ারম্যানের সাথে কাউন্সিলরদের দূরত্ব তৈরি হয়। আবার অনেক সময় দলীয় বিবেচনায় বিভিন্ন স্কিম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হলেও তা বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন[৩৭] ও বিধিমালা[৩৮] অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণকে সম্পৃক্ত করে বাজেট ঘোষণা করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপর ২০১১ সালে টিআইবি পরিচালিত বেইজলাইন জরিপ[৩৯] অনুযায়ী, জরিপের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেট সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, উন্মুক্ত আলোচনা এবং নোটিস বোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে বলে জানা যায়, যদিও ৩৬.৪% প্রতিষ্ঠান বাজেট প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে এবং বাজেট উন্মুক্ততা সম্পর্কে ৪.৭% খানা অবহিত।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ বিতরণে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম: কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক বরাদ্দ ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন এবং জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে হয়, যেমন ইউনিয়ন পরিষদে এলজিএসপি-২ এর বরাদ্দ। তবে অনেক প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক বরাদ্দ শুধুমাত্র শ্রেণির ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, যেমন পৌরসভার বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। এছাড়া যেসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিরোধীদলীয় চেয়ারম্যান/ মেয়র থাকে সেখানে বিশেষ উন্নয়ন বরাদ্দ কম দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া একটি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শেষ কিস্তি দেরিতে ছাড় করার কারণে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয় না। অনেক সময় দরপত্র ডাকার পরও কাজ শুরু করা যায় না।

বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ পেতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হতে হয় না। তবে বিভিন্ন প্রকল্প ও বিশেষ বরাদ্দ পাওয়া এবং অর্থ ছাড় করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয় বলে তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রকল্প পাওয়ার জন্য এবং প্রকল্পের অর্থ ছাড় করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হয়। ঘুষের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বরাদ্দের পরিমাণ কম-বেশি হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প ভেদে ১% থেকে ১০% পর্যন্ত ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউজিপ-এর (UGIIP) কাজ (রাস্তাঘাট তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেন তৈরি) পাওয়ার জন্য কোনো কোনো পৌরসভাকে ১% ঘুষ দিতে হয় এবং বিশেষ বরাদ্দ পাওয়ার জন্য ১০% ঘুষ দিতে হয়।

---

[৩৬] ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত সংশোধিত এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে (২,২২,৪৯১ কোটি টাকা) স্থানীয় সরকার বিভাগের বরাদ্দের (১২,৯৬০ কোটি টাকা) শতকরায় দেখানো হয়েছে।

[৩৭] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫৭ (২), *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৯২ (২), *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৭৭ (৩), *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮*, ধারা ৩৮ (১), *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৪৬ (৩)।

[৩৮] *উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ণ ও অনুমোদন) বিধিমালা*, ২০১০, ধারা ১৪(১-৫)

[৩৯] টিআইবি নিয়মিত অধিপরামর্শ সভা করে থাকে, এমন ১৪টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে এই জরিপে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দশটি পৌরসভা, তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ ও একটি সিটি কর্পোরেশন ছিল।

৩.১.৫ তথ্যের উন্মুক্ততা

একটি প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন ও সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক নজরে তথ্য পাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য 'নাগরিক সনদ' প্রবর্তন করা হয়েছে। আইন[৪০] অনুসারে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অধিদপ্তর নিজ নিজ আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে, এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর এসব তথ্য হালনাগাদ করতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নাগরিক সনদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, টিআইবি'র বেইজলাইন জরিপ ২০১১-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৫০% স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ রয়েছে। নাগরিক সনদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোন সেবা কার কাছ থেকে, কোথা থেকে পাওয়া যাবে এবং কীভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের অভাব লক্ষ করা যায় এবং অনেকক্ষেত্রে এ সকল সনদ উন্মুক্ত স্থানে টাঙানো থাকে না।

আবার 'জনগণের মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক পিছিয়ে আছে। পৌরসভার ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের এই হার ৩৬.৪%, যা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ৫০.০% (টিআইবি ২০১১)। ইউনিয়ন পরিষদে ই-তথ্য সেবা চালু থাকলেও খুব কম মানুষ ই-তথ্য সেবা নিতে আসে বলে জানা যায়। এর কারণ হিসেবে তথ্যদাতারা জানায়, ই-তথ্য কেন্দ্র এবং এর সেবা সম্পর্কে খুব কম মানুষের ধারণা আছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থাকলেও এলজিইডি বাদে অন্যান্যগুলোর ওয়েবসাইট উন্নত নয় এবং হালনাগাদ তথ্য নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকাংশ সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট রয়েছে। তবে এসকল ওয়েবসাইটের তথ্য হালনাগাদ করা হয় না। কিছু পৌরসভার নামমাত্র ওয়েবসাইট থাকলেও বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদেরই কোনো ওয়েবসাইট নেই। এছাড়া কিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নোটিস বোর্ড নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নোটিস বোর্ড থাকলেও সেখানে সকল তথ্য দেওয়া হয় না।

৩.১.৬ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের হিসাব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত করা হবে, এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সরকারকে প্রেরণ করা হবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪১] এছাড়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত অনিয়ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরিষদ দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে এবং নিরীক্ষককে অবহিত করবে বলে ইউনিয়ন পরিষদের আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪২] স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিশাখা ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কর্তৃক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ উদ্যোগে নিরীক্ষা করা হয়। তবে এলজিএসপি প্রকল্পের নিরীক্ষা অনেক সময় বেসরকারি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিষদ যদি কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে নিরীক্ষক যেকোনো সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদকে উপযুক্ত নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এবং তা অবশ্যই পালনীয় হবে। কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোনোরূপ আর্থিক অনিয়ম বা পরিষদের অন্য যেকোনো অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ সরকার বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক বা একাধিক কর্মকর্তা তদন্ত করতে পারবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়।[৪৩] গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়:

৩.১.৬.১ নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে অবৈধ লেনদেন: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা থেকে নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের ঘুষ, উপঢৌকন দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছানুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে নিরীক্ষা কর্মকর্তাকে ৫,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে বছরে সাধারণত 'গ' শ্রেণির জন্য ৪০,০০০ টাকা, 'খ' শ্রেণির জন্য ৬০,০০০ টাকা এবং 'ক' শ্রেণির জন্য ৮০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকন দেওয়া হয় এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হয়। নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা মেটাতে পারলে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে উল্লেখযোগ্য কোনো ধরনের আপত্তি থাকে না। তথ্যদাতাদের বক্তব্য অনুযায়ী নিরীক্ষার ক্ষেত্রে দুই ধরনের কথা প্রচলিত আছে, যথা: "অডিট করাবেন, না অডিট করব?"। অর্থাৎ নিরীক্ষা করার সময়ে নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা (ঘুষ, আপ্যায়ন প্রভৃতি) পূরণ করা হলে তাকে 'অডিট করাবেন' বলে ধরা হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছানুযায়ী নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ থাকে। অন্যদিকে যখন নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের চাহিদা পূরণ করা হয় না, তারা তাদের নিয়ম অনুযায়ী নিরীক্ষা করে থাকে তখন তাকে 'অডিট করব' বলে ধরা হয় (শারমীন ও অকরাম ২০১৩)।

---

[৪০] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৪৯ (১), *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫৩ (১), *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৪৪, *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন* ২০১১, ধারা ৬৮ক (১)।

[৪১] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫৯ ও ৬০; *উপজেলা পরিষদ আইন*, ১৯৯৮, ধারা ৪০; *জেলা পরিষদ আইন* ২০০০, ধারা ৪৭; *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৯৪, *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৭৭।

[৪২] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫৯ ও ধারা ৬০।

[৪৩] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৭৩।

৩.১.৬.২ নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী অনিয়মের ধরন: নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে যেসব নিরীক্ষা আপত্তি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া, আয়কর বাবদ কম টাকা আদায় করা, ঠিকাদারদের বিল হতে মূল্য সংযোজন কর আদায় না করা, রোড রোলার এর ভাড়া আদায় না করা, শিডিউলের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত না করা, অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতা-বহির্ভূত কার্যসম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়, চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (শারমীন ও অকরাম ২০১৩)। অনেক নীরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি হয় না।

৩.১.৭ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি মনিটরিং, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে অধিদপ্তরের নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট, পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ' (আইএমইডি) রয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা তাদের অর্থায়নকৃত প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করে। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী উপজেলা নির্বাচন অফিসার, মৎস্য কর্মকর্তা, সমবায় কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা, কৃষি অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পরিবীক্ষণ করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিবীক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম লক্ষ করা যায়।

৩.১.৭.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আইএমইডি থেকে পরিবীক্ষণের ঘাটতি: স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে একটি অনুবিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে 'বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ'(আইএমইডি) থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করা হয় না। জনবলের স্বল্পতার কারণে আইএমইডি থেকে যথাযথভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণ করা হয় না। এছাড়া সকল প্রকল্প পরিবীক্ষণ না করে নমুনায়নের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন করে পরিবীক্ষণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সাধারণত দুই বছরে একবার পরিবীক্ষণ করার জন্য পাঠানো হয়। এছাড়া আইএমইডি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার অল্প সংখ্যক প্রকল্প পরিবীক্ষণ করে।

৩.১.৭.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যাবলী অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে পরিবীক্ষণ করা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যাবলী কাদের দ্বারা পরিবীক্ষণ করা হবে সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা নেই। এ সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্মকাণ্ড কারিগরী বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি (যেমন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা) দিয়ে পরিবীক্ষণ করা হয়। তাই তারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ করতে পারে না। ফলে কাজের মান ভালো হয় না।

৩.১.৭.৩ পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়: পরিবীক্ষণ কর্মকর্তারা প্রকল্প পরিবীক্ষণ করার সময় ঠিকাদার হতে ঘুষ আদায় করে। ঘুষ প্রদান না করলে তারা কাজের ক্রটি চিহ্নিত করে থাকে। একজন তথ্যদাতা উল্লেখ করেছেন যে, "মূল বিষয় হল ভাগ। ভাগ পাইলে সবাই চুপ, না পাইলেই চিৎকার।"

৩.১.৭.৪ গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা না পাওয়া: তথ্যদাতাদের মতে, নির্দিষ্ট কিছু সূচকের ওপর ভিত্তি করে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত ছক পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এসব নির্দেশকের ভিত্তিতে শুধু পরিমাণগত তথ্য পূরণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে পাঠানো হয়। ফলে কাজের গুণগত মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না।

৩.১.৭.৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার প্রভাব: বাস্তবায়িত প্রকল্পের মূল্যায়ন করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরামর্শক নিয়োগ করে। কিন্তু একটি প্রকল্পের সবগুলো স্কিম পরামর্শকরা পরিদর্শন করে না, বরং এক্ষেত্রে প্রকৌশলী অথবা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী পরামর্শকরা প্রকল্পের বিভিন্ন স্কিম পরিদর্শন করে। ফলে কোনো প্রকল্প সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারনা ব্যতিত পরামর্শকরা মূল্যায়ন করে থাকে।

৩.১.৭.৬ প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্পের কার্যকরতা ব্যাহত: কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকল্প-পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রকল্প কার্যকার ও টেকসই হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে চেয়ারম্যান, সদস্য ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করে। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এলজিইডি এবং সুবিধাভোগীরা এক বছর পর্যন্ত প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ করবে। পরবর্তীতে শুধুমাত্র সুবিধাভোগীরা তা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তথ্যদাতাদের মতে, একটি জেলায় এলজিইডি'র রেগুলেটর/ স্লুইস গেট নির্মাণের পর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ছয়-সাত মাস পর তা অকার্যকর হয়ে যায়, কারণ কমিটির সদস্যদের আগ্রহ পাঁচ-ছয়মাস পর হ্রাস পায়। রেগুলেটর/ স্লুইস গেটের রাবার, হাতল নষ্ট হয়ে যায় এবং তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে নতুন পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি আবার নতুনভাবে এই প্রকল্পটি হাতে নেয় (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)।

৩.১.৮ আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের অভাব

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে কাজের সম্বন্বয় নেই। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইন অনুযায়ী সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলেও তা কার্যকর নয়। জেলা পরিষদের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এই সমন্বয়হীনতা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সমন্বয় না থাকার কারণে জেলা পরিষদের সম্পত্তি (জমি, গাছ, খেয়াঘাট, মার্কেট নির্মাণ প্রভৃতি) জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন দখল করে নেয় (শারমীন ২০১৪)।

৩.২ অবকাঠামোগত সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় অবকাঠামোগত সমস্যা বিরাজমান। পুরানো সিটি কর্পোরেশনগুলোর নগর ভবন ও ওয়ার্ড অফিসগুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা ভাল হলেও নতুন সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। তথ্যদাতাদের মতামত এবং পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সিটি কর্পোরেশনের জোনাল অফিসগুলোর অনেকগুলোই জরাজীর্ণ এবং কক্ষের স্বল্পতা রয়েছে। অনেক ওয়ার্ড অফিসের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বরাদ্দ থাকলেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় তৈরি করা যাচ্ছে না। সিটি কর্পোরেশনের যেসব ওয়ার্ডে, নিজস্ব ওয়ার্ড অফিস নেই সেখানে ভাড়া করা বাড়িতে বসে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস করে। এসব অফিসে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব থাকায় প্রশাসনিক কাজে বিঘ্ন ঘটছে। পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌর ভবনগুলোর মান ভাল। তবে বেশিরভাগ ওয়ার্ডের নিজস্ব অফিস নেই। এছাড়া যেসব পৌরসভার ওয়ার্ড অফিস আছে তা জরাজীর্ণ এবং বসার কক্ষের অভাব আছে। উল্লেখ্য, নারী কাউন্সিলার/ সদস্যদের বসার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা নেই। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক (প্রায় ২৩%) পরিষদের নিজস্ব ভবন নেই। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নব-নির্মিত ইউনিয়ন কমপ্লেক্সগুলো উন্নত হলেও পুরাতন অফিস ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে সদস্যদের বিশেষকরে নারী সদস্যদের বসার জন্য আলাদা কোনো কক্ষ নেই এবং বসার জায়গার স্বল্পতা রয়েছে, ফলে প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয় (টিআইবি ২০০৯ ও ২০১১)। উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রায় ২৯% পরিষদের নিজস্ব ভবন নেই। এছাড়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বিভিন্ন অধিদপ্তর বিশেষকরে ওয়াসার জোনাল অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরগুলোর অনেক গুলোই জরাজীর্ণ এবং কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে।

৩.২.১ লজিস্টিকসের পর্যাপ্ততা ও ব্যবহার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাগ্রহীতাদের বসার জন্য পর্যাপ্ত চেয়ার নেই। নথিপত্র রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নথি মেঝেতে রাখা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটার নেই। অধিকাংশ কম্পিউটার কর্মকর্তাদের কক্ষে থাকে তাই কর্মকর্তারা ব্যস্ত থাকলে অপারেটররা কাজ করতে পারে না বলে তথ্যদাতারা জানায়। এছাড়া প্রকল্পের লজিস্টিকস ব্যবহার করার জন্য অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের কোনো নীতিমালা নেই, ফলে প্রকল্প শেষে এগুলো অন্য কোন প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে না নিলামে তোলা হবে প্রভৃতি নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ করা যায়।

প্রকল্প তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি নেই ফলে তদারকি যথাযথভাবে করা হয় না। কর্মকর্তারা এবং ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা-কর্মী অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গাড়ি ব্যবহার করে।[৪৪] নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের নামে যেসব গাড়ি কেনা হয় তা পরিবহন পুলে জমা দেওয়ার কথা, তবে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ বলে পরিবহন পুল এসব গাড়ি ফেরত দিয়ে দেয় (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)। এছাড়া গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সিটি কর্পোরেশনে অনেক সচল গাড়ি গ্যারেজে অকেজো হিসেবে দেখানো হয় এবং সেসব গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি করার ফলে তা অকেজো হয়ে যায়। গাড়ির সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও গাড়ি ওয়ার্কশপে পাঠানো এবং ভুয়া বিল দাখিলের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়[৪৫]।

৩.৩ উপসংহার

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার খাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম এবং দুর্নীতি বিদ্যমান। আইন অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়া, কোনো কোনো স্থায়ী কমিটি গঠিত হলেও কার্যকর না থাকা, জনবলের স্বল্পতা, নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি এবং নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতা অভাব, জনবলের স্বল্পতা, ঘুষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় সরকার খাতের বাজেট বরাদ্দের হার ক্রমান্বয়েহ্রাস পাচ্ছে এবং বিশেষ বরাদ্দ পেতে ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া প্রকল্প পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাব এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও লজিস্টিকসেরও ঘাটতি রয়েছে, এবং লজিস্টিকস ব্যবহারে অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান।

---

[৪৪] জেলা পরিষদ ও এলজিইডিতে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

[৪৫] এলজিইডি এবং সিটি কর্পোরেশনে এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং ক্রয়ে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন (এলজিআরডি) ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদন মূলত দুইটি ধাপ যথা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং লজিস্টিকস ক্রয়ে সরকারি দরপত্র প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ অধ্যায়ে প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায়, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অনিয়ম চিহ্নিত করে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন ও লজিস্টিকস ক্রয়ের প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অনিয়ম চিহ্নিত করে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায়

বাংলাদেশ সরকারের যেকোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের পরিকল্পনা করার জন্য ধারণা তৈরি, ধারণার মূল্যায়ন, প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হয়। একটি প্রকল্প অনুমোদনের আগে বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করতে হয়, যথা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, গঠন, পুনরায় পর্যবেক্ষণ, সময়সীমা নির্ধারণ। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সম্পৃক্ত থাকে। তবে প্রধান তিনটি কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এলজিইডি), সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন একটি প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত থাকে (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)।

৪.১.১ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ: প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সিটি কর্পোরেশন ও এলজিইডি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প প্রণয়নে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পৌরসভায় এলজিইডি থেকে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নিযুক্ত থাকে। আবার অনেক সময় প্রকল্পের নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে, প্রকল্পের পরিকল্পনা বা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সাধারণ জনগণের সাথে সভা করে মতামতের ভিত্তিতে সব সময় করা হয় না। এ ব্যাপারে জনগণ জানে না। ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এলজিইডির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকল্পের নকশা করে, এবং ইউপির চেয়ারম্যান শুধু জায়গা নির্ধারণ করে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে সাধারণ জনগণের (শিক্ষক, ডাক্তার, ইমাম, ইউপি) সম্পৃক্ততা থাকে। কিন্তু প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় চেয়ারম্যান ব্যতীত সাধারণ জনগণের ভূমিকা অধিকাংশ সময় থাকে না। এলজিএসপি বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ার্ডে শতকরা পাঁচজন ভোটারের উপস্থিতি ও মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করা হয় না।[৪৬]

৪.১.২ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যা

নিচে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.১.২.১ ধারণা হতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতা: প্রকল্পের ধারণার মূল্যায়ন করার সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করতে হয়। একটি প্রকল্প ধারণা থেকে প্রস্তাব তৈরির পর্যায়ে যেতে কমপক্ষে দুই থেকে তিন মাস প্রয়োজন হয়। এছাড়া একটি প্রকল্প পরিকল্পনা থেকে শুরু করে অনুমোদন পাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজন হয় এবং এর পর বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে অনেক প্রকল্পের চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রয়োজন হয়। প্রায় সব প্রকল্প পরিকল্পনা একাধিকবার সংশোধন করতে হয়।[৪৭] স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের। বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা যায়, প্রকল্পের বিতরণকৃত বরাদ্দ প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ থেকে কম বা বেশি হয়। এটিও বাস্তবায়ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতার একটি কারণ। উদাহরণস্বরূপ 'মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার' প্রস্তাবনার পর অনুমোদন পেতে প্রায় তিন বছর সময় লাগে এবং আংশিক[৪৮] বাস্তবায়নের কাজ শেষ হতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগেছে।

৪.১.২.২ প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব: উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে (সাহায্য বা ঋণ হিসেবে) বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রথমে কোন খাতে (যেমন

[৪৬] দেখুন পরিশিষ্ট-১: কেস স্টাডি - এলজিএসপি।

[৪৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।

[৪৮] এখনও চলমান।

অবকাঠামো উন্নয়ন, পানিসম্পদ উন্নয়ন বা কৃষিসম্পদ উন্নয়ন) অর্থায়ন করবে তা চিহ্নিত করে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত করে, এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে[৪৯], অর্থাৎ কোন খাতে প্রকৃতপক্ষে অর্থায়ন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ দ্বারা তা নির্ধারিত হয় না। এরপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এলজিইডি থেকে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সহায়তায় অথবা তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তার সহায়তায় এবং এলজিইডি নির্দেশিত খাতকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করে থাকে। এমনকি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দাবি অনুযায়ী বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়।

৪.১.২.৩ রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন: ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিরা যেসব এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেসব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে বিবেচনা করে প্রকল্প পরিকল্পনা করে থাকে। ফলে দেখা যায় একেক সরকারের আমলে কিছু বিশেষ এলাকার উন্নয়ন বেশি হয়ে থাকে। এছাড়া এলাকা নির্দিষ্ট করে প্রকল্প পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পরও সংসদ সদস্যরা তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকেন, যার ফলে প্রকল্প পরিকল্পনায় পরিবর্তন করতে হয়,[৫০] ফলে প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া যেসব প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করে তার এলাকা নির্বাচনে মেয়র, সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৪.১.২.৪ সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন: দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা, দারিদ্র্যবিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, পরিবেশ দিকগত বিবেচনা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করার জন্য প্রকল্প প্রণয়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়।[৫১]

টিআইবি'র এক গবেষণায় দেখা যায়, ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় এবং এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করা হয় (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)। প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছকে প্রস্তাব, প্রকল্প মূল্যায়ন কাঠামোর (PAF-Project Appraisal Framework) তথ্য, পিএএফ অনুসরণে প্রকল্প সারসংক্ষেপ মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সারণি, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল সমীক্ষার প্রতিবেদন যথার্থভাবে দেওয়া হয় না। এছাড়া বাইরের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। স্বজনপ্রীতি এবং যোগসাজশের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়। ফলে বিশেষজ্ঞরা বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবেদন প্রণয়ন না করে নিজস্ব বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে ধারণা সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে।[৫২] এছাড়া জেলা পরিষদেও চলমান বেশিরভাগ প্রকল্প যাচাই-বাছাই ছাড়া অনুমোদন দেওয়া হয়।[৫৩]

৪.১.২.৫ দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব: স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) পরামর্শ বিবেচনা করে জেলা পরিষদ পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে বলে আইনে উল্লেখ রয়েছে।[৫৪] কিন্তু এ পর্যন্ত জেলা পরিষদে বিভিন্ন স্তরের পরামর্শ বিবেচনা না করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কোনো ধরনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। প্রতিবছর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে উল্লিখিত বরাদ্দ অনুযায়ী জেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়।[৫৫] এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধিমালা অনুযায়ী এখনো বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। উপজেলা পরিষদের আইনে পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন আইনে পাঁচসালা পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।[৫৬]

৪.২ উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন পর্যায়

এলজিইডি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বের নির্মিত অবকাঠামো কিছু সময় পরপর সংস্কার করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের[৫৭] রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সংস্কারমূলক কাজ বেশি হয়।[৫৮] গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ মূলত এলজিইডি করে থাকে। তবে এলজিএসপি প্রকল্পের কাজ ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা বাস্তবায়িত

[৪৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।
[৫০] প্রাগুক্ত।
[৫১] পরিকল্পনা বিভাগ, 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি', মে ২০০৮।
[৫২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।
[৫৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন (২০১৪)।
[৫৪] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৪৯।
[৫৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন (২০১৪)।
[৫৬] *ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা বিধিমালা) ২০১৩*, ধারা ৩, *উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮*; ধারা ৪২ (১)।
[৫৭] ওয়াসা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তিতাস গ্যাস, বিটিসিএল, ডেসা/ডেসকো, মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি ইত্যাদি।
[৫৮] ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে প্রায়ই দেখা একই রাস্তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খোঁড়খুড়ির জন্য প্রায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে হয়।

হয়। উন্নয়নমূলক কিছু কাজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, বিশেষ করে এলজিএসপি প্রকল্পের কাজ কোটেশন পদ্ধতিতে এই কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।[৫৯]

বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অধিদপ্তর আয় কর, ভ্যাট এবং ঠিকাদারের লভ্যাংশ বিবেচনায় রেখে স্থানীয় বাজার দর হিসাব করে। বাজার দর ঠিক করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষে 'সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮' (পিপিআর ২০০৮) অনুযায়ী দরপত্র দেওয়া অথবা কোটেশনের ভিত্তিতে ক্রয় করতে হয়। পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী এক কোটি টাকার বেশি হলে উন্মুক্ত দরপত্র ডাকার ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর ওয়েবসাইটে এবং প্রসিদ্ধ প্রত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। এক কোটি টাকার কম হলে শুধু প্রসিদ্ধ প্রত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়। পরবর্তীতে দরপত্রের শিডিউল বিক্রি, শিডিউল জমা, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন এবং মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।[৬০] স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রকল্পভেদে দরপত্র আহবানে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো ইউনিয়ন পরিষদে এলজিএসপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাধারণত পাঁচ লাখ টাকার কম হলে কোটেশন পদ্ধতিতে, পাঁচ থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত লটারির মাধ্যমে এবং দশ লাখ টাকার বেশি হলে উন্মুক্ত দরপত্র ডাকা হয়। তবে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কম থাকাতে কোটেশন পদ্ধতিতেই বেশি ক্রয় হয়।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে যেসব দরপত্র এলজিইডি আহবান করে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার এলজিইডি কার্যালয়ে বিল দাখিল করে। এলজিইডি কার্যালয় থেকে অনুমোদনের পর হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের (সিজিএ) কার্যালয়ে বিল পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, একটি প্রকল্পে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার বিবরণী এলজিইডি এবং সিজিএ উভয় কার্যালয়েই থাকে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিজিএ কার্যালয় থেকে চেক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রাখা হয়। অন্যদিকে বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঠিকাদার কাজ সম্পন্ন করার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার এলজিইডি কার্যালয়ে বিল দাখিল করে। এলজিইডি এবং বৈদেশিক সংস্থার পরামর্শক দ্বারা অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের টিম লিডার চেক দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বৈদেশিক অর্থায়নের প্রকল্পের অর্থ যেকোনো তফসিলভুক্ত ব্যাংকে রাখা হয়। তবে এলজিইডির সহযোগিতায় যে সকল প্রকল্প পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন করে থাকে সে সমস্ত প্রকল্পের বিল অনুমোদনে প্রকল্পের পরামর্শকের স্বাক্ষরের পর পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন প্রদান করে থাকে। এছাড়া পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের অন্য সরকারি বরাদ্দের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নিজেরা বিল প্রদান করে থাকে। তবে বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংস্থার প্রকল্পের পরামর্শক দ্বারা অনুমোদনের পর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বিল প্রদান করে থাকে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায় দেখতে গিয়ে এ গবেষণায় গ্রাম এবং শহর-কেন্দ্রিক বড় দুটি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প দেখা হয়েছে, স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প-২ (এলজিএসপি-২) এবং আরবান পার্টনারশিপ ফর পভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর)। প্রকল্প দুটি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দুর্নীতি-অনিয়মের ক্ষেত্রে দু-রকম চিত্র দেখা গেছে, যা কেস স্টাডি আকারে তুলে ধরা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১ ও ২)। কেস স্টাডি, তথ্যদাতাদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বা অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় চলমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর নিম্নে আলোচনা করা হল।

৪.২.১ দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনিয়মঃ দরপত্র প্রত্রিয়ায় কিছু অনিয়ম করা হয়। অনেক সময় পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করা হয়। পিপিআর অনুযায়ী যেসব দরপত্র উন্মুক্ত আহ্বান করা উচিত তা না করে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ফলে সরকার রাজস্ব হারায়। দরপত্রের বিজ্ঞাপন সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে দেওয়া এবং বাস্তবায়ন সংস্থার নোটিস বোর্ডে টানানোর নিয়ম থাকলেও তা করা হয় না। এছাড়া যেসব অনিয়মের মাধ্যমে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেগুলো হল বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বেই ঠিকাদার অবহিত হওয়া, পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, শিডিউল প্রাপ্তির জন্য সীমিত সময় দেওয়া, শিডিউল কেনার সময় রাজনৈতিক প্রভাব, রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র শিডিউল জমা, দরপত্রের শিডিউল জমা দিতে না দেওয়া, অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে শিডিউল জমা দেওয়া, শিডিউল জমা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতা না পাওয়া এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত না হওয়া (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির ধরন তুলে ধরা হল (বিস্তারিত দরপত্র নিয়ন্ত্রণ পরিশিষ্ট ৩-এ দেখানো হয়েছে)।

[৫৯] উল্লেখ্য, যেসব প্রকল্পের/ উন্নয়নমূলক কাজের বাজেট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে থাকে তার দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান করে থাকে এবং বাস্তবায়নের অবস্থা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকৌশলী, এলজিইডি থেকে প্রেষণে নিযুক্ত প্রকৌশলী/প্রকল্পের প্রকৌশলী, সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ। আর যেসব প্রকল্পের উন্নয়ন বাজেট এলজিইডিতে থাকে তার দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে কার্যাদেশ দেওয়া পর্যন্ত সব কাজ এলজিইডি সম্পন্ন করে এবং বাস্তবায়নের অবস্থা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে এলজিইডি, সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

[৬০] *সরকারি ক্রয় বিধিমালা*, ২০০৮, বিধি ২৭, এবং তফসিল-২।

চিত্র ৪.১: দরপত্র প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির ধরন

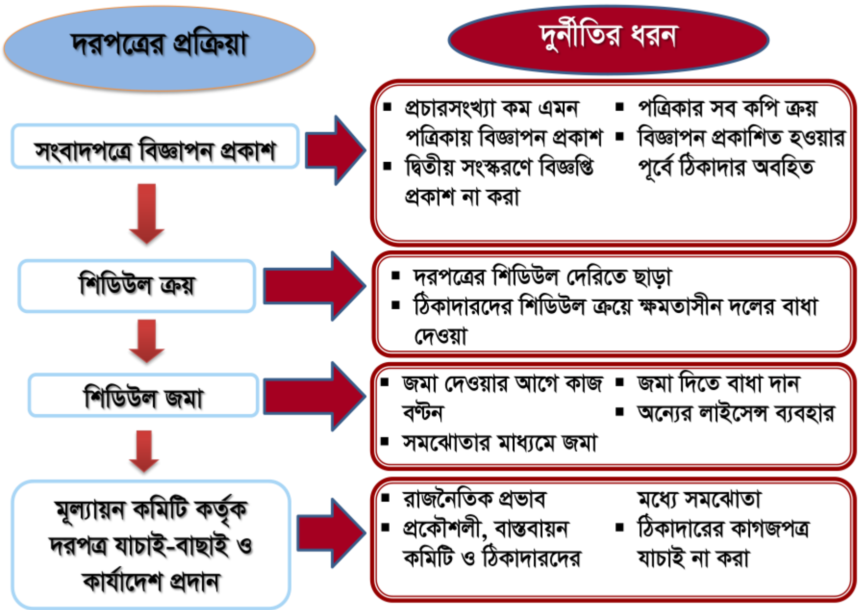

৪.২.২ কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি: গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় পর্যায়ে কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া সাধারণত রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতিকরা এই কার্যাদেশ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ভিন্ন দলের হলে উভয় দলের রাজনীতিকরা কার্যাদেশ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং মন্ত্রী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কার্যাদেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, আর এই নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে সাধারণত দরপত্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (শারমীন ও আকরাম ২০১৩; আকরাম ২০১৩)। অনেক সময় জনপ্রতিনিধিদের আস্থাভাজনদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দরপত্র নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে অনেক সময় অরাজনৈতিক ব্যক্তিরাও থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কাজের বরাদ্দের ১০%-২০% পর্যন্ত কাজ দেওয়ার জন্য আদায় করা হয়। উল্লেখ্য, এই হার সিটি কর্পোরেশন এবং এলজিইডি'র ক্ষেত্রে একই যা ১০%-২০%।

কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মেয়র, বাস্তবায়ন কমিটি অথবা অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর সহযোগিতা ছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের কার্যাদেশ পাওয়া সম্ভব নয়। কার্যাদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তাদের সমঝোতা হয়ে থাকে এবং তারা কমিশন পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতার মাধ্যমে দরপত্র জমা দেওয়ার আগেই কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বরাদ্দের ১০%-১৫% সমঝোতাকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য এই হার ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং এলজিইডি'র ক্ষেত্রে একই যা ১০%-১৫%।

৪.২.৩ কার্যাদেশ পাওয়ার পর বিক্রি করা: বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্থানীয় পর্যায়ের ঠিকাদারদের তথ্য অনুযায়ী কার্যাদেশ পাওয়ার পর অনেক সময় ঠিকাদাররা তা বিক্রি করে দেয়। এক্ষেত্রে যাকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় সে কাজ সম্পাদন না করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশনের বিনিময়ে অবৈধভাবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। সাধারণত কার্যাদেশ পাওয়া পর্যন্ত যে খরচ হয় এবং দরপত্র মূল্যের ১০-১৫% রেখে বিক্রি করে। উল্লেখ্য এই হার পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং এলজিইডি'র ক্ষেত্রে একই যা ১০%-১৫%। এক্ষেত্রে যেকোনো ঠিকাদার কাজটা ক্রয় করতে পারে। তবে যার নামে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে দায়িত্ব বহন করতে হয়।

৪.২.৪ বিল এবং জামানতের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে সমস্যা ও অনিয়ম: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এবং অধিদপ্তরে সাধারণত মেজারমেন্ট বুক (এমবি), ভাউচারের মাধ্যমে বিল করা হয়। আবার কিছু বিল মাস্টাররোল, ভাউচারের মাধ্যমে করা হয়। কাজ শেষে জামানতের টাকা উঠানো হয়। পিপিআর অনুযায়ী প্রকল্পের জামানতের টাকা কাজ শেষের ২৮ দিনের পর তোলা যায়। বিল এবং জামানতের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ও অনিয়ম আছে যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

৪.২.৪.১ কাজ চলাকালীন ও বিল ওঠানোর জন্য কমিশন আদায়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নমূলক কাজের বিল কয়েকটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদেরকে প্রদান করার কথা থাকলেও অনেক সময় কাজের একটি অংশ শেষ করেই কার্যাদেশের পুরো বিল তুলে নেয় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। তবে এজন্য ঠিকাদারদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুষ দিতে হয়। কাজ চলাকালীন যারা পরিবীক্ষণ করতে আসে, যেমন নিজস্ব প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা, এলজিইডি থেকে প্রেষণে

নিযুক্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প পরামর্শক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা - তাদেরকে ঘুষ দিতে হয়। তাদেরকে ঘুষ না দিলে নথিতে সমস্যা দেখায় এবং ঘুষ ছাড়া কোনো ফাইল স্থানান্তরিত হয় না। এছাড়া প্রকৌশল বিভাগ ও হিসাব বিভাগকে টাকা না দিলে বিলের টাকা পাওয়া যায় না। স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদারদের বক্তব্য অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এই হার কার্যাদেশ মূল্যের ৫% থেকে ১০%।[৬১] উল্লেখ্য, পৌরসভার ক্ষেত্রে এই হার ৫% থেকে ৮% এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ৭% থেকে ১০%। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৌশলীকে বিলের ২% থেকে ৩% দিতে হয় - না দিলে বিলের টাকা পাওয়া যায় না। এছাড়া হিসাবরক্ষককে ১% এবং এলজিইডি থেকে নিযুক্ত কর্মকর্তা বা পরামর্শক যদি থাকে তাকে বিলের ২% থেকে ৩% দিতে হয়।

তবে এলজিইডি'তে কাজ শেষ করবার পর অর্থ ছাড় করতে ক্ষেত্র বিশেষে নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকল্প পরামর্শক, উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক (ফান্ড রিলিজ), কোষাধ্যক্ষকে কার্যাদেশ মূল্যের ৮.৫% থেকে ১০.৫% ঘুষ দিতে হয়। এই অর্থ না দিলে অনেক সময় পুরো বিলের টাকা পাওয়া যায় না। স্থানীয় পর্যায়ে একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রতিটি স্তরে উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে উপস্থিত থাকতে হয় বলে ঠিকাদারকে তাকে বিলের ২% থেকে ৩% দিতে হয়। এবং ল্যাবরেটরি টেস্টের জন্য টেকনিশিয়ানকে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয় (শারমীন ও আকরাম ২০১৩)।

এছাড়া কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিল তোলার সময় বিভিন্ন স্তরে ঘুষ দিতে হয়। ফলে ঠিকাদাররা লাভের অংশ ধরে রাখতে গিয়ে কাজের গুনগত মান ভাল রাখতে পারে না যা ঠিকাদারদের বক্তব্য ও পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

৪.২.৪.২ জামানত এবং বিলের টাকা ওঠানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা: একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে কাজ শেষে সেই অর্থ ছাড় করতে সাধারণত অনেক দেরি হয়। এর অন্যতম কারণ তহবিলে টাকা না থাকা এবং অবৈধ অর্থ আদায়ের চেষ্টা। ঠিকাদারদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একটি কাজ থেকে যা লাভ হয় সেই টাকা তুলতে পাঁচ-ছয় মাস প্রয়োজন হয় যে কারণে ঠিকাদাররা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার উন্নয়নমূলক কাজের জামানতের টাকা তুলতে অনেক সময় লাগে। বিশেষ করে এলজিইডি'র বাস্তবায়নে সরকারি প্রকল্পের জামানতের টাকা এক বছরের আগে তোলা যায় না। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রেও ঠিকাদাররা সঠিক সময়ে জামানতের টাকা তহবিলের স্বল্পতার জন্য তুলতে পারে না।[৬২]

৪.২.৫ বাস্তবায়ন পর্যায়ে অর্থ আত্মসাৎ ও অন্যান্য আর্থিক দুর্নীতি: প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে দুর্নীতির পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তর কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি করে থাকে, যেমন একই প্রকল্প একাধিকবার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া প্রকল্প (কাগজপত্রে প্রকল্পের নাম থাকলেও বাস্তবে কিছু করা হয়নি) দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, অর্ধেক কাজ করে অর্থ আত্মসাৎ, পূর্বের শেষ হওয়া প্রকল্পের কাজ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, চলমান এক প্রকল্পের কাজ অন্য প্রকল্পে দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের স্কিমের নকশা প্রণয়নে সহায়তা পেতে এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীকে বরাদ্দের ২%-৩% এবং ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরকে ক্ষেত্রবিশেষে ঘুষ, উপঢৌকনসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। এলজিএসপি'র নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ১১২টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। যার ফলে এসব ইউনিয়ন পরিষদে কোনো ধরনের বরাদ্দ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (পরিশিষ্ট ১: কেস স্টাডি-এলজিএসপি)। ইউপিপিআর প্রকল্পে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকায় কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতি না হলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বরাদ্দ বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। সিডিসির বরাদ্দ পেতে ঘুষ দেওয়া এবং অর্থ আত্মসাৎ এক্ষেত্রে অন্যতম। এসব অনিয়মের অভিযোগে কয়েকজন[৬৩] টাউন ম্যানেজারকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এছাড়া এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব এবং কম টাকায় কাজ করিয়ে নিয়ে বেশি টাকা বিল করে অর্থ আত্মসাৎ এর তথ্য পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ২)।

৪.৩ লজিস্টিকস ক্রয় প্রক্রিয়া এবং অনিয়ম

বর্তমানে অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী কোটেশন পদ্ধতিতে লজিস্টিকস ক্রয় করে থাকে। তবে সিটি কর্পোরেশনগুলো লজিস্টিকস ক্রয়ের বরাদ্দ বেশি থাকায় উন্মুক্ত দরপত্র বেশি ডাকে। মান নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং পণ্য সংগ্রহের তত্ত্বাবধান কমিটি পণ্য পরীক্ষা করার পর রেজিস্ট্রার অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা হয়। পণ্য ক্রয় প্রক্রিয়ায় পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম সম্পাদনের জন্য লজিস্টিকস ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনেকসময় পূর্ব নির্ধারিত ঠিকাদারদের পরিচিত এবং প্রচারসংখ্যা কম এমন পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে আগেই ঠিকাদারদের

[৬১] উল্লেখ্য, এই হার স্থানীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সকল প্রকল্প এলাকার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।
[৬২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।
[৬৩] গাজীপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম এলাকার টাউন ম্যানেজার।

সাথে যোগসাজশ করা হয়। এমনকি টাকার বিনিময়ে শিডিউল জমা দেওয়ার আগে দরপত্র মূল্য ঠিকাদারকে জানানো হয়। উন্মুক্ত দরপত্র এবং কোটেশন পদ্ধতিতে কাজ পেতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি মেয়র/ চেয়ারম্যান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রাপ্ত কাজের মূল্যের ১০-১৫% ঘুষ দিতে হয়। কাজের বিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দিতে হয়।

অনেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিজস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আছে আত্মীয়-স্বজনদের নামে এবং তারা দরপত্র প্রাপ্তিতে প্রভাব খাটায়। এছাড়া অনেক সময় একই ঠিকাদারের কাছ থেকে বারবার দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে সামগ্রী ক্রয় করা হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যাপকভাবে কাজ করে। তবে অনেকসময় এক-দুইজন ঠিকাদার থাকায়, প্রতিষ্ঠানে লজিস্টিকস প্রাপ্তিতে দ্রুততা এবং আর্থিক উপযুক্ততা বিবেচনায় একই প্রতিষ্ঠানকে ঠিকাদারি দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া অনেক সময় নিরাপত্তা এবং নিয়মিত পরিবীক্ষণের অভাবে অনেক লজিস্টকস চুরি হয় ফলে পুনরায় ক্রয় করতে হয়। আবার কিছু লজিস্টিকস চাহিদা বিবেচনা না করে ক্রয় করা হয় এবং তা স্তূপাকারে জমতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে লজিস্টিকস না কিনে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়, আবার কম দামে কিনে দাম বেশি দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ইউনিয়ন পরিষদের বিরুদ্ধে এলজিএসপির বরাদ্দের অর্থে ফটোকপি মেশিন, পাখা, চেয়ার-টেবিল, ক্যাবিনেট ক্রয়ের কথা থাকলেও, ক্রয় না করে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ আছে। এছাড়া লজিস্টিকস ক্রয়ের পরে তা আবার ঠিকাদারের (যে ঠিকাদার লজিস্টিকস সরবরাহ করেছে) কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ওয়ার্ডের পরিষ্কার-পরিছন্নতার জন্য ঝুড়ি, কোঁদাল, বেলচা, নারিকেলের সলাকা, ঝাড়ু ইত্যাদি ক্রয় করে বিতরণ করা হয় ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পরিছন্ন কর্মীদের দেওয়ার জন্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এগুলো পরিছন্ন কর্মীদের না দিয়ে তা ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে দেয়।

৪.৪ উপসংহার

স্থানীয় সরকার খাতের বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে আসে, যেখানে অনেক অংশীজনের সম্পৃক্ততা থাকে এবং যা সময়সাপেক্ষ। প্রকল্পের ধারণা হতে বাস্তবায়ন পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে ধারণা হতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতা, প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন করা ও এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিপিআর অনুসরণ না করা, দরপত্র কিংবা কোটেশন পদ্ধতিতে কাজ পেতে ঘুষ দেওয়া, বিল ওঠানোর জন্য ঘুষ দেওয়া, ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে এবং প্রকল্পের সকল কাজ না করে অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি অনিয়ম-দুর্নীতি দেখা যায়।

সেবামূলক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

ভৌত-অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পার্যায়ে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, কর আরোপ, পানি সেবা, ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, বিচার-সালিশ প্রভৃতি সেবামূলক কাজ উল্লেখযোগ্য। এ অধ্যায়ে এ ধরনের সেবা নিতে গিয়ে জনগণ কী ধরনের অনিয়মের শিকার হয়, এবং এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা কী তা আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ সনদ ও সনদ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণত জনগণ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, প্রত্যয়নপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সনদ সংগ্রহ করে। টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় এই সনদ সংগ্রহে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৫.৭% বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের শিকার হয় (টিআইবি ২০১২)। এসব অনিয়মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঘুষ (৯৫.৮%) ও সময়ক্ষেপণ (৮.২%)। যেসব সেবাগ্রহীতা খানা ঘুষের উল্লেখ করেছে তারা গড়ে ৯৪ টাকা দিয়েছে।

২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে আরও দেখা যায়, যেসব সেবাগ্রহীতা সনদ সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে তাদের ৬৩.৭% জন্ম নিবন্ধন সনদ সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। ২০০৬ সালে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন পাশ করার পর সকলের জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু ২০১১ সালে টিআইবি পরিচালিত জরিপে[৬৪] দেখা যায় এসব প্রতিষ্ঠানের এলাকাভুক্ত খানার ৭৫.৪% এর ক্ষেত্রে সকল সদস্যের নিবন্ধন হয়েছে (টিআইবি ২০১১)। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ঘরে ঘরে গিয়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে ঘরে ঘরে গিয়ে আর নিবন্ধন করা হয় না; জনগণ তাদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানে যেয়ে নিবন্ধন করে। তবে তথ্যদাতাদের মতে, এখন পর্যন্ত সকল খানার সকল সদস্যের জন্ম নিবন্ধন হয়নি যদিও বর্তমানে যারা জন্ম নিবন্ধন করেছে তাদের নামের তালিকা কম্পিউটারে নথিভুক্ত করার উদ্যোগ সারা দেশে শুরু হয়েছে।

৫.২ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩১.৫% দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি দারিদ্র্য নিরসনের একটি অন্যতম পরিকল্পনা, যার মূল উদ্দেশ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা দেওয়া। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য ২৫,৩৭১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখে যা জাতীয় বাজেটের[৬৫] ১১.৪০%। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রায় ৯০টি কর্মসূচি রয়েছে, যার মধ্যে ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), টেস্ট রিলিফ (টিআর), বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের ভাতা, দরিদ্র মাতাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা), কর্মসংস্থান কর্মসূচি, দুর্যোগ-পরবর্তী দরিদ্রদের সহায়তা ভাতা উল্লেখযোগ্য।

ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, কাবিখা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের জন্য চাল কিংবা গম সরবরাহ করা হয়। ভিজিডি[৬৬], ভিজিএফ, টিআর, কাবিখা[৬৭] সবগুলো বরাদ্দ উপজেলা হয়ে পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদে আসে। এদের মধ্যে শুধু ভিজিডির বরাদ্দ আনার জন্য পরিবহন ভাতা আছে। ভিজিডির চাল বিতরণ বিষয়ে উপজেলা নারী বিষয়ক কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে চিঠি দেন এবং চাল পরিবহনের ভাতা দেন। এছাড়া সমাজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার কাছে প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড থাকে এবং তিনি টাকা তুলে প্রতিবন্ধী পরিবারকে বিতরণ করেন। পৌরসভা এলাকায় ভিজিএফ কমিটির চাল বিতরণ করার কথা যেখানে মূল দায়িত্ব মেয়রের। বিতরণের সময় সাধারণত মেয়র, নিযুক্ত কর্মচারী, পুলিশ, ডিসির প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অফিসার, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি থাকে। পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে টিআর বরাদ্দের ২০%-২৫% কাজের মধ্যে রয়েছে রাস্তায় মাটি দেওয়া, ড্রেন কাটা বা এ ধরনের কাজ, যা সাধারণত কাউন্সিলর/ মেম্বাররা জনবল নিয়োগ দিয়ে করিয়ে থাকে। বাকি বরাদ্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, স্কুল) কমিটিকে দেওয়া হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে মেয়র/ চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর/ মেম্বার, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর/ মেম্বার, প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্যান্য সদস্য থাকে।

---

[৬৪] ২০১১ সালে ১৪টি এলাকা নিয়ে টিআইবি বেইজলাইন জরিপ করে যার মধ্যে দশটি পৌরসভা, তিনটি ইউনিয়ন পরিষদ এবং একটি সিটি কর্পোরেশন ছিল।

[৬৫] ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ২,২২,৪৯১ কোটি টাকা।

[৬৬] ভিজিডি শুধু উপজেলা হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বিতরণ করা হয়।

[৬৭] কাবিখা'র বরাদ্দ শুধু উপজেলা হয়ে ইউনিয়ন পরিষদে আসে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান/ মেয়র এবং সদস্য/ কাউন্সিলরদের মতামত অনুযায়ী চাহিদা/ প্রয়োজনের তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের (ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা) বরাদ্দ কম এবং দিনে দিনে কার্ডের সংখ্যা কমছে। শুধু ভিজিডির বরাদ্দ আনার জন্য পরিবহন ভাতা থাকলেও তা কিলো-প্রতি ২৩ টাকা যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ভিজিডিসহ অন্যান্য ভাতার বরাদ্দ যা পরিবহন করে পরিষদে আনতে হয় সেক্ষেত্রে পরিবহন খরচ বস্তা বেচে অথবা চেয়ারম্যান / মেয়রের পকেট থেকে দিয়ে সমন্বয় করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়ে থাকে। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৩৫.৮% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৫০.৪%) খানাকে গড়ে ১,০৪৮ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা (৪.০%) আরও জানায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ছাড়াও দলীয় প্রভাব[৬৮] বা রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত[৬৯] করা হয়। মেয়র বা চেয়ারম্যান নিজের দলীয় লোকদের মাঝে কিছু কার্ড বিতরণ করে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২২.৯% খানা সময়ক্ষেপণ এবং ২.২% খানা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের শিকার হয়। এছাড়া, ১৫.৭% খানা স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। জরিপে দেখা যায়, ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বেশি। ঘুষ না দিলে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না বলে উল্লেখ করে ৯২.৫% খানা (টিআইবি ২০১২)। একই জরিপে আরও দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের ৪৫% নারী এবং তাদের মধ্যে ৪২.৭% দুর্নীতির শিকার, যেখানে এ ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী পুরুষদের ২৯.৮% দুর্নীতির শিকার (টিআইবি ২০১২)। এই তথ্য থেকে বলা যায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে নারীরাই বেশি দুর্নীতির শিকার হয়। ফলে অনেক সময় প্রকৃত দরিদ্ররা বঞ্চিত হয়। অনেক সময় একই পরিবারে একের অধিক ব্যক্তি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় যা সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধিমালা ভঙ্গ করে। যোগ্যতার মানদণ্ডে অনেকসময় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন হয়। অন্তর্ভুক্ত হতে যে খরচ হয় তা অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে (পিপিআরসি ২০১২)।

অনেক সময় কার্ড দেরিতে আসে। যার কারণে কাউন্সিলর অনেক সময় ভুল তথ্য দিতে বাধ্য হয়।[৭০] আবার বর্তমানে যারা মারা গেছেন তাদের পরিবর্তে নতুন কার্ড দেওয়া হবে না, এই কারণে কাউন্সিলররা সেই সদস্যের খানার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে কার্ড গ্রহীতাকে মৃত দেখানোর কোনো উদ্যোগ নেয় না। কাউন্সিলররা কার্ড যার নামে তাকে অসুস্থ লিখে দেয় এবং মৃত ব্যক্তির খানার অন্য সদস্য টাকা তুলে আনে। আবার প্রতিবন্ধী কেউ মারা গেলে সমাজ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা তার কার্ড দিয়ে টাকা তুলে আত্মসাৎ করে। কাউন্সিলররা লিখিত না দেওয়া পর্যন্ত এভাবে টাকা আত্মসাৎ হতে থাকে।

ভিজিডি, ভিজিএফ এর বরাদ্দ গোডাউন থেকে অনেক সময় কম আসে। আবার বস্তা ফুটা থাকার কারণে বরাদ্দ কম পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে উপকারভোগীদের কী পরিমাণ চাল দেওয়া হবে তা জানিয়ে বিতরণ করা হয়।[৭১] বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক ভোক্তা কম চাল পান। আবার অনেকে একটুও চাল পান না, সম্পূর্ণ চাল কাউন্সিলরা আত্মসাৎ করে বলেও তথ্য পাওয়া যায়। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২৪.১% নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখার শিকার হন। পৌরসভা এলাকায় ভিজিএফ কমিটির চাল বিতরণ করার কথা থাকলেও কমিটির লোকেরা কর্মচারীদের নিযুক্ত করে। এছাড়া পৌরসভা এলাকায় যদি গোডাউন থেকে এক পোয়া চাল কম আসে, তাহলে আধা কেজি করে কম চাল বিতরণ করা হয় কারণ যেসব কর্মচারী চাল বিতরণ কার্যক্রমে সহায়তা করে তাদের প্রত্যেকদিন কিছু চাল দিতে হয়। কারণ হিসেবে পৌরসভার কাউন্সিলররা জানান, চাল না দিলে, কর্মচারীরা কাজ করতে চায় না যেহেতু তারা ভিন্ন বিভাগে কাজ করে। এছাড়া অনেকসময় পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে পৌরসভা এলাকায় কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে তৈরি ভুয়া কার্ডের মাধ্যমে চাল নিয়ে যায় এবং তখন চাল স্বল্পতায় পড়তে হয়।

টিআর এবং কাবিখা'র বরাদ্দ অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং এর নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কমিটিসমূহ গোডাউন থেকে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসে, এবং সেই টাকা দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করায়। উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার (পিআইও'র) কাবিখাসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের পরিবীক্ষণ ও তদারকি করার কথা এবং তার স্বাক্ষর ছাড়া বিলের টাকা পাওয়া যায় না। বরাদ্দের অর্থ ছাড় করতে টন প্রতি তাকে ১,০০০-১,৫০০ টাকা করে দিতে হয়। টিআর-এর ক্ষেত্রে যেকোনো কমিটির কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। উভয়ক্ষেত্রে মাস্টাররোলের মাধ্যমে কাজের বিল করা হয়। বিল করার

---

[৬৮] মূলত সরকারদলীয়, উপজেলা চেয়ারম্যানের দল ও সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের প্রভাব।

[৬৯] ভিজিডি/ ভিজিএফ এর ক্ষেত্রে দুই বছর পরপর নাম পরিবর্তন করে নতুন লোকদের পরবর্তী দুই বছরের জন্য নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

[৭০] মাতৃত্বকালীন ভাতা তারাই পায় যার বাচ্চার বয়স সর্বোচ্চ ৯০ দিন এবং হতদরিদ্র। তারা কার্ড পেলে তিন কিস্তিতে ৮,৪০০ টাকা পান। যেহেতু কার্ড দেরিতে আসে সেহেতু বাচ্চার বয়স কম করে দেখাতে হয় অথবা মা গর্ভকালীন অবস্থায় আছে তা দেখাতে হয়। ফলে কার্ড প্রাপ্তির সময় যার বাচ্চার বয়স তিন মাসের মধ্যে আছে এবং অনেক দরিদ্র তারা অনেক সময় কার্ড পায় না।

[৭১] টিআইবি পরিচালিত বেইজলাইন জরিপ ২০১১ থেকে দেখা যায়, যেসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান চাল দেওয়ার পরিমাণ উপকারভোগীদের কাছে জানিয়ে বিতরণ করে, সে সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপকারভোগীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল পায় বলে জানায়।

সময় মাস্টাররোল বেশি দেখিয়ে ঘুষের টাকার সমন্বয় করা হয়। অনেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম দেখিয়ে বরাদ্দ তুলে আত্মসাৎ করে এমন তথ্যও পাওয়া যায়। যেসব কর্মী কাজ করে না তাদেরও নাম ও ঠিকানা অনেকসময় মাস্টাররোল লিস্টে দেখা যায় (পিপিআরসি ২০১২)। আবার অনেক সময় অন্য প্রকল্পের কর্মী দিয়েও কাজ করানো হয়।[৭২] ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান/ মেয়র, সদস্য/ কাউন্সিলর এবং ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের মতে, ইউনিয়ন পরিষদে টিআর/ কাবিখা আসলে সেখানে আবার দলীয় লোকদের ভাগ দিতে হয়। প্রতি কিস্তি চাল/ গমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাজ দলীয় লোকদের মাধ্যমে হয়। কাজ না করলে দলীয় লোকেরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের কাছে বিক্রি করে দেয়।

৫.৩ বিচার ও সালিশ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিচার ও সালিশ করে থাকে। আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে দীর্ঘদিন মামলা-মোকদ্দমা চালানো ব্যয়সাপেক্ষ। দরিদ্র জনসাধারণকে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, মামলা-মোকদ্দমা ও খরচের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য সরকার গ্রাম ও শহরাঞ্চলের প্রাথমিক বিচারের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত করেছে।[৭৩] সে হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত ও সালিশি বোর্ড এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সালিশি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে (স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম আদালত ও সালিশি বোর্ড গঠিত) অনেক সময় নানাবিধ কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে সৃষ্ট বিরোধের মীমাংসায় ভূমিকা পালন করতে হয় এবং কিছু কিছু মামলার বিচার করতে হয়।

টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৮.৫% খানা বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশ সংক্রান্ত সেবা নেয়। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, বিয়ে, পারিবারিক বিরোধ, ধারদেনা, মারামারি, নারী নির্যাতন এবং অন্যান্য বিরোধ নিয়ে খানার সদস্যরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিষ্পত্তিকালে ৩৪.১% খানার সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। বিচার ও সালিশে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল সময়ক্ষেপণ (৪০.৯%), নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় (৩৫.৮%), স্বজনপ্রীতি (৩২.৩%), প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর হস্তক্ষেপ (৩১.২%), ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় (১০.৫%) এবং প্রতারণা (৯.৫%)। যেসব খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৪,৫২১ টাকা দিতে হয়েছে। এই ধরনের বিচার ও সালিশে মুখোমুখি হওয়া সদস্যদের ২০.৪% নারী এবং ৭৯.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৩৩.৫% এবং পুরুষদের ৩১.৪% দুর্নীতির শিকার হয় (টিআইবি ২০১২)।

২০১১ সালে টিআইবি পরিচালিত বেইজলাইন জরিপে দেখা যায়, ৯২.৯ শতাংশ নারী প্রতিনিধিরা বিচার ও সালিশে অংশগ্রহণ করে। তবে এই অংশগ্রহণ স্থানীয় সরকার ভেদে ভিন্ন হয়। বেইজলাইন জরিপে আরো দেখা যায়, পৌর এলাকায় নারীদের অংশগ্রহণের হার ইউনিয়ন পরিষদের থেকে বেশি এবং নারী প্রতিনিধিরা সাধারণত নারী বিষয়ক সালিশ বিচারে অংশগ্রহণ করে থাকে তবে তাদের (২৩.১%) মতামতের গুরুত্ব অনেকসময় দেওয়া হয় না। টিআইবি পরিচালিত অন্য এক গবেষণা অনুযায়ী, সালিশে নারী প্রতিনিধিদের ওপর চেয়ারম্যান বা মেয়র প্রভাব বিস্তার করে (হক ২০১২)। এছাড়া বিচার-সালিশের লিখিত রায় বাদি-বিবাদিকে প্রদান করা হয় না এবং সংরক্ষণ করা হয় না।

বিচার-সালিশ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা বিদ্যমান। ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে অবকাঠামোগত সমস্যা এবং আসবাবপত্রের সমস্যা প্রকট। এছাড়া রয়েছে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অসহযোগিতার মনোভাব, পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা ঠিকমতো না পাওয়া। বিচারের জন্য গ্রাম আদালতকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লোকবলের ঘাটতি রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের মতে, প্রশাসনিক কাজের চাপ অনেক বেশি থাকার কারণে বিচার-সালিশের রায় লিখিতভাবে সংরক্ষণ, বিচার-সালিশের দিন ধার্য এবং আয়োজন করা তাদের পক্ষে সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না।

৫.৪ ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া ও ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

যে কোনো ধরনের ব্যবসা পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকারের (কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ) কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুমতিপত্রকে 'টেড লাইসেন্স' বলা হয়। ট্রেড লাইসেন্সটি যার নামে জারি করা হয় তাকেই এর একমাত্র বৈধ মালিক হিসেবে ধরা হয় এবং লাইসেন্সটি হস্তান্তরযোগ্য নয়। প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি ব্যক্তি যে কোনো ধরনের ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত এবং এই লাইসেন্স প্রতি বছর নবায়ন করতে হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেদনকারী দালাল অথবা লাইসেন্স সুপারভাইজারের কাছে প্যাকেজ ভিত্তিতে ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ করে থাকে, এই প্যাকেজের একাংশ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ। তবে প্যাকেজ ছাড়া অন্যান্য

---

[৭২] *দৈনিক প্রথম আলো*, 'কর্মসংস্থান শ্রমিকদের দিয়ে কাবিখার কাজ', ২০ নভেম্বর ২০১৩।

[৭৩] *গ্রাম আদালত আইন*, ২০০৬; *বিরোধ মিমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ডের আইন*, ২০০৪; *বিরোধ সালিস (মিউনিসিপ্যাল এলাকা) বিধি*, ১৯৮০।

ক্ষেত্রে যারা লাইসেন্স পাওয়ার ধাপ অনুসরণ না করে এবং সকল নথি না দিয়ে লাইসেন্স পায়, তাদের সাধারণত লাইসেন্স প্রাপ্তির আগে ঘুষ দিতে হয়।

টিআইবি পরিচালিত জরিপে (২০১২) দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ৬.৫% খানার সদস্য নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে যার মধ্যে ১৬.৬% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক ৯০.৭% খানার সদস্যকে নির্ধারিত ফি এর চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। যে সকল খানার সদস্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে তাদের গড়ে ৪৫৬ টাকা দিতে হয়েছে। তবে নতুন ট্রেড লাইসেন্স করার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ খানার সদস্য ঘুষ ও সময়ক্ষেপণের শিকার হয় কারণ এক্ষেত্রে চালানের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া হয়। নতুন লাইসেন্স প্রদান করার ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানের এই হার সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেশি দেখা যায়।

ট্রেড লাইসেন্সের সমস্যা উদঘাটনের জন্য, ২০০৭ সালে ডিসিসি এলাকায় টিআইবি জরিপ করে। জরিপে ডিসিসির রেজিস্ট্রি খাতা অনুসারে নমুনা হোল্ডিংয়ের অনেকটিতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা পাওয়া যায়নি। এছাড়া ব্যবসার স্থাপনা পরিদর্শন না করেই লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ কারণে নির্মাণাধীন ভবনের ঠিকানায় লাইসেন্স প্রাপ্তির তথ্য পাওয়া যায়, যা ডিসিসি'র ট্রেড লাইসেন্স বিধিমালার বিরোধী।[৭৪] এছাড়াও ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স বিধিমালা অনুযায়ী একটি লাইসেন্সে লাইসেন্সধারীর ব্যবসার সকল ধরন লিপিবদ্ধ করার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় দেখা যায়। অনেক দোকানই রেজিস্ট্রি খাতা অনুসারে যে সকল ব্যবসা করার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসা করে। এ অবস্থা ঢাকা শহরের সর্বত্র লক্ষ করা যায়। কিন্তু তা প্রতিরোধের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপ খুব জোরালো নয়। এর পেছনে কাজ করে ব্যবসায়ী বনাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তদারকির ঘাটতি ও দুর্নীতি। এর ফলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রতিবছর মূল্যবান রাজস্ব হারায়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের নির্দিষ্ট কোনো হার নেই। ঘুষ না দিলে লাইসেন্স পেতে বেশি সময় লাগে। দালালের সাহায্য ছাড়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছে গেলে, অনেক সময় দালালের মাধ্যমে করলে যে পরিমাণ টাকা দিতে হয় তার সমপরিমাণ বা কম দিতে হয়। তবে দালাল ধরলে সাধারণত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর তুলনায় বেশি সময় ও বেশি টাকা লাগে। ট্রেড লাইসেন্সধারীর প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে ঘুষ আদায়ের পরিমাণ নির্ভর করে। এছাড়া গবেষণায় আরও পাওয়া যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অথবা দালাল কর্তৃক অবৈধ অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় নথি বিক্রয় করা হয়। এ ধরনের সমস্যা শুধু ঢাকা শহরে নয়, সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে বিরাজমান।

৫.৫ হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ ও প্রদানে অনিয়ম

বাংলাদেশে হোল্ডিং কর বলতে ভূমি অথবা ভবনের সাথে ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা এবং বিজলি বাতির ব্যবস্থার জন্য খাজনাকে বোঝানো হয়। হোল্ডিং করের পরিমাণ ভবনের বার্ষিক মূল্যের ওপর নির্ভর করে। গ্রাম ও শহরের গৃহ নির্মাণ এবং জীবন যাপনের ভিন্নতার কারণে শুধু শহর এলাকার ক্ষেত্রে হোল্ডিং কর প্রযোজ্য হয়। গ্রামাঞ্চলের জনগণ এলাকার নিরাপত্তার জন্য চৌকিদারি কর দিয়ে থাকে যা বাড়ি ঘরের বার্ষিক মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদেরকে বিজলি বাতি এবং ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য কর দিতে হয় না।

টিআইবি পরিচালিত খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ৩০.৬% হোল্ডিং কর বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গিয়েছে, যাদের ৬.৭% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৭৯.০% খানাকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে এবং গড়ে ২৬০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। এই নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সর্বাধিক ৮৮.৬% খানা টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করে। এছাড়া দ্রুত সেবা পাওয়া, প্রভাবশালীর সাথে যোগাযোগ না থাকা, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা না থাকা এবং তথ্য না থাকার কারণে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয় (টিআইবি ২০১২)।

৫.৫.১ মূল্য নির্ধারণ এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা

গবেষণায় হোল্ডিং কর নির্ধারণ এবং সংগ্রহ পদ্ধতিতে নিচের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৫.১.১ কম বা অধিক মূল্য নির্ধারণ: হোল্ডিংয়ের কর কম নির্ধারণে মালিকদের উৎসাহ লক্ষণীয়। বৈধ নথির অভাবে এবং অবৈধ অর্থ আদায়ের জন্য নির্ধারকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়া কার্যকর তদারকি ও পরিবীক্ষণের

[৭৪] ডিসিসির রেজিস্ট্রি খাতা অনুসারে ২০০৭ সালে জরিপ চলাকালীন সময়ে উত্তরার একটি ভবনের থেকে কিছু নমুনায়ন করা হয় যেখানে ট্রেড লাইসেন্স ডিসিসি থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু জরিপের জন্য ভবন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ভবনটি নির্মাণাধীন এবং এ অবস্থায় অনেকে লাইসেন্স নিয়েছেন যা মূলত ডিসিসি'র ট্রেড লাইসেন্স বিধিমালার বিরোধী।

অভাব হোল্ডিংগুলোর কম কর নির্ধারণের জন্য দায়ী। তবে কখনো কখনো হোল্ডিংয়ের মালিকেরা অবৈধ অর্থ না দেওয়ায় নির্ধারকেরা বেশি কর নির্ধারণ করে।

৫.৫.১.২ অনিয়মিত পুনঃমূল্য নির্ধারণ: সাধারণত পুনঃমূল্য নির্ধারণ পাঁচ বছর পরপর হওয়ার কথা। ভবনের পরিবর্তন কিংবা নতুন ভবন তৈরির কারণে অন্তর্বর্তী মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় কিছু অন্তর্বর্তী মূল্য নির্ধারণ হলেও তা অনিয়মিত এবং ঘুষের বিনিময়ে বন্ধ থাকে। এছাড়া নিয়মিত পুনঃমূল্য নির্ধারণ হওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ এলাকায় তা করা হয় না।

৫.৫.১.৩ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা: মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি খুবই ধীর গতিসম্পন্ন। সিটি কর্পোরেশনের ওপর টিআইবি পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, যেসব ক্ষেত্রে মালিকেরা ঘুষ দেয়নি বলেছেন সেসব ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি আরও ধীরে হয়। এছাড়া নতুন ভবনের কর নির্ধারণের প্রক্রিয়াতে ধীরগতি এবং ভবন উন্নয়নের নথি যথাযথ লিপিবদ্ধ না হওয়ায়, কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়।

৫.৫.১.৪ 'ম্যানুয়াল' পদ্ধতিতে কর ব্যবস্থাপনা: বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে এখনো ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনা শুরু হয়নি। হোল্ডিংগুলোর কম্পিউটারাইজড ডেটাবেইজ নেই। হাতে বিল তৈরি করার ফলে কখনো কখনো সময়মতো বিল তৈরি করা সম্ভব হয় না। এছাড়া খতিয়ান খাতায় উঠাতেও সমস্যা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে কর প্রদানের পরপরই তা তহবিলে জমা হয় না কারণ তহবিলে জমা হওয়ার ক্ষেত্রে খতিয়ান খাতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। কখনো কখনো কর প্রদানের পরও বকেয়া পরিশোধের জন্য নোটিস প্রদান করা হয়। এছাড়া ডিজিটাল হোল্ডিং কর ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

৫.৫.১.৫ আঞ্চলিক অফিস এবং বাড়ি থেকে হোল্ডিং কর আদায়ের ব্যবস্থা: বাড়ি বাড়ি গিয়ে নগদ টাকা সংগ্রহে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। নগদ টাকা হস্তান্তরের কারণে সংগৃহীত রাজস্বের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৭৫] এছাড়া কর পরিশোধ করার জন্য যারা আঞ্চলিক অফিসে যায়, তাদের ঘুষ ও কর পরিশোধের পরও নোটিস, হয়রানি মামলার মুখোমুখি হতে হয়।[৭৬]

৫.৬ পানি পরিসেবা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, এলাকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠান যেমন ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর পানি সেবা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান শুধু অগভীর এবং গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এবং এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো অগভীর এবং গভীর নলকূপসহ পাইপলাইনের মাধ্যমেও পানি সেবা দিয়ে থাকে। কিছু প্রতিষ্ঠান পাতকূয়া এবং সংরক্ষিত জলাধার বা পুকুরের মাধ্যমেও পানি সেবা দিয়ে থাকে।

পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রদেয় পানি সেবার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হতে হয়। টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায় উত্তরদাতা খানার ৩.৪% স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অধিদপ্তর থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সেবা নিয়েছে (নতুন সংযোগ, পুনঃসংযোগ, পাইপ লাইনের আকার বর্ধিতকরণ ইত্যাদি সেবা) যার মধ্যে ১০.২% কোনো না কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর ৩২.০%-কে ঘুষ দিয়ে সেবা নিতে হয়েছে। দুর্নীতি বা অনিয়মের মধ্যে ছিল, নতুন সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক ঘুষ দাবি, রাস্তা কাটার অনুমতি পেতে ঘুষ দেওয়া, পরিদর্শন রিপোর্ট পাওয়ার জন্য অফিসে বারবার যোগাযোগ, কাগজপত্র ঠিক থাকার পরও সময়ক্ষেপণ, অফিস কর্তৃক আবেদন পত্র হারানো, পুনঃসংযোগ পেতে ঘুষ দেওয়া, পাইপ লাইনের আকার বর্ধিতকরণের জন্য অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু গ্রাহককে অতিরিক্ত বা ভৌতিক বিলের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ করে তেমন কোনো লাভ হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহককে ঘুষ দিয়ে বিলের টাকা কমিয়ে আনতে হয়। তবে বিল তৈরির পদ্ধতি, বিল প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ইত্যাদি কিছু বিষয়কে ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলো দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু এলাকায় গ্রাহকেরা এর সুফল পেতে শুরু করেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণত নলকূপের মাধ্যমে পানি সেবা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, টাকা নিয়েও নলকূপ না দেওয়া ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যায়। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় এক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

---

[৭৫] উত্তরা থানাধীন একজন সংগ্রহকারী এক হোল্ডিং এর কর আদায় সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ান খাতায় প্রকৃত মূল্যের কম অংক বসানোর কারণে বহিষ্কৃত হন। ঐ সংগ্রহকারী হোল্ডিং এর মালিকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ করার পর নিবন্ধন খাতায় কম উল্লেখ করে, তবে মালিকের প্রাপ্ত রশিদে টাকার অংক ঠিকই ছিল।

[৭৬] ২০০৭ সালের টিআইবি পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার যেসব হোল্ডিং এর মালিক কর পরিশোধ করার জন্য আঞ্চলিক অফিসে গিয়েছিলেন তাদের ৫৬.১৯%-কে ঘুষ দিতে হয়েছে।

৫.৭ আবর্জনা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান নাগরিক সেবা আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ। প্রধান রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া, ড্রেন পরিষ্কার, ফুটপাত এবং বাজার নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি অন্যতম দায়িত্ব। তবে সিটি কর্পোরেশন ও কিছু কিছু পৌরসভা তাদের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট জায়গায় (dumping ground) অপসারণ করে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনগুলোতে কোরবানীর সময়ে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয় এবং ডোবা-নালা, পুকুর থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) জনগণের কাছ থেকে হোল্ডিং করের একটা অংশ (স্থানীয় সরকার ভেদে ভিন্ন) আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণের জন্য সংগ্রহ করে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায়[৭৭] দেখা যায়, এ খাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মীর অভাব আছে।[৭৮] ফলে সকল রাস্তা, ফুটপাত, বাজার, ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। আবার ডাম্পিং গ্রাউন্ডেও লোকবলের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া ড্রেনগুলো নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা হয় না বলে বৃষ্টি হলে রাস্তায় পানি জমে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহে অনেকক্ষেত্রে বাড়ির মালিকরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার বাড়ির সামনের ড্রেন থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করিয়ে থাকে। টিআইবি পরিচালিত বেইজলাইন জরিপ (২০১১), রিপোর্ড কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২ ও ২০১৩)[৭৯] ও ডিসিসির ওপর জরিপ (২০০৭) অনুযায়ী জনগণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না। অন্যদিকে এসব গবেষণায় রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকার পেছনে জনগণের সচেতনতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অনেক রাস্তার পাশে ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকে এলাকায় পর্যাপ্ত ডাস্টবিন না থাকার জন্য।[৮০] জনগণকে সচেতন করার জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা অনেক সময় কিছু লিফলেট বিতরণ, বর্ষপঞ্জি তৈরি, কিছু পত্রিকায় ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত।[৮১] অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারীরা তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত সময়সীমার পরে সেকেন্ডারি পয়েন্ট[৮২] থেকে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে যার ফলে রাস্তাসমূহ অনেক সময় নোংরা থাকে।

কনজারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট ময়লা পরিবহনের জন্য যে ট্রিপ বরাদ্দ করে তা শহর থেকে ময়লা অপসারণের জন্য পর্যাপ্ত। কিন্তু ময়লা পরিবহনকারী গাড়ির চালকেরা তা থেকে কম ট্রিপ দেয়। ফলে শহরে আবর্জনা থেকে যায়। চালকেরা পরিষদ অনুমোদিত একটি নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্প থেকে তেল সংগ্রহ করে। তারা পেট্রোল পাম্প থেকে কম তেল নিয়ে বরাদ্দকৃত ট্রিপের তেলের বিল করে এবং অব্যবহৃত ট্রিপের তেল বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে পেট্রোল পাম্পে বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করে।

রাস্তায় ইট, বালি, পাথর ও অন্যান্য ময়লা ফেলে রাখার জন্য সাজা এবং জরিমানার বিধান থাকলেও তা অনেক সময় প্রয়োগ করা হয় না। প্রধান সড়ক নিয়মিত পরিষ্কার করা হলেও আশপাশের রাস্তা পরিষ্কার করা হয় না এবং তা কেউ তদারকি করে না। এছাড়া মাস্টাররোল পরিচ্ছন্ন কর্মী এবং ড্রাইভারদের সুপারভাইজার মাঝেমধ্যে পর্যবেক্ষণ করে। এছাড়া আবর্জনা সংগ্রহ ও যথাযথভাবে স্থানান্তর করতে কত খরচ হয় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোনো পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নেই।

আবর্জনা অপসারণ কাজে নিয়োজিত অনেক কর্মচারী প্রায়ই তাদের কাজ থেকে বিরত থাকে, যার ফলে আবর্জনা অপসারণের কাজ এবং শহরের সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজ ব্যাহত হয়। কর্মচারীদের এই দায়িত্বহীনতা কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টরদের ঘুষ নেওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টররা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার সময় অবৈধভাবে আংশিক টাকা কেটে রাখে যা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কিছু কর্মচারীর মধ্যে ভাগ হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে অনুপস্থিতির জন্য জনপ্রতি ২২৫ টাকা এবং বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রথম মাসের বেতন থেকে ৩০০ টাকা দিতে হয়। এই কেটে রাখার হার অনুপস্থিতি, বেতন বৃদ্ধি, চাকরি স্থায়ীকরণ, বদলি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

---

[৭৭] টিআইবি পরিচালিত রিপোর্ট কার্ড জরিপ, বেইজলাইন জরিপ, সিটি কর্পোরেশনের ওপর চলমান গবেষণা।

[৭৮] ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হোল্ডিং করের ছয় ভাগের এক ভাগ আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য আদায় করা হলেও প্রোগ্রাম খরচ অনেক কম। কিন্তু বেশি খরচ হয় স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মাস্টার রোল কর্মচারীর বেতনের জন্য। তবে উল্লেখ্য, ডিসিসির সকল মাস্টাররোল কর্মচারীকে ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মী হিসেবে দেখানোর ফলে খরচ এ খাতে বেশি দেখানো হয়ে যায় কিন্তু বাস্তবে খরচ কম হয় কারণ অনেকে মালি, লিফট ম্যান ও অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে কাজ করে এমন কর্মী বেতন নেয় কনজারভেন্সি কর্মী হিসেবে।

[৭৯] ঝিনাইদহ পৌরসভা (২০১২), কুষ্টিয়া পৌরসভা (২০১১), মাদারীপুর পৌরসভা (২০১২), চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা (২০১৩), ফরিদপুর পৌরসভা (২০১১), কুড়িগ্রাম পৌরসভা (২০১১) এর ওপর রিপোর্ট কার্ড জরিপ।

[৮০] প্রধান সড়ক ও আশেপাশের সড়ক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মী ঝাড়ু দেওয়ার পরে রাস্তার পাশে অবস্থিত দোকানসমূহ খোলা হয় এবং ঝাড়ু দেওয়া হয় ফলে রাস্তা আবার নোংরা হয়ে পড়ে। এছাড়া জনগণ এবং স্থানীয় কর্মী (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়োজিত কর্মী বা প্রতিষ্ঠান) যারা বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে তারা সঠিকভাবে ময়লা-আবর্জনা ডাস্টবিনে রাখে না।

[৮১] এছাড়া সকল এলাকায় প্রচারণা, সকল পত্রিকায় ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন না দেওয়ায় অধিকাংশ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি।

[৮২] সেকেন্ডারি পয়েন্ট হচ্ছে যেখানে কর্মীরা ঝাড়ু দিয়ে আবর্জনা স্তূপ করে রাখে অথবা যে ডাস্টবিনে স্থানীয় কর্মীরা আবর্জনা ফেলে।

শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য কিছু বিশেষ কর্মসূচি যেমন ডোবা-নালা, পুকুর থেকে কচুরিপানা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ কনজারভেন্সি ডিপার্টমেন্টের মাস্টাররোল কর্মচারীদের নাস্তা খাওয়ার জন্য কিছু টাকা দিয়ে করানো হয় এবং কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী মিথ্যা স্বাক্ষর বা টিপসই দিয়ে প্রদেয় কর্মসূচির মজুরি বাবদ বরাদ্দের টাকার অঙ্ক দেখিয়ে দেওয়া হয়।

অধিকাংশ স্থানীয় সরকার পরিষদে হাসপাতালের আবর্জনা ফেলার জন্য আলাদা কোনো ডাস্টবিন নেই। তবে কিছু কিছু হাসপাতাল ব্যবহৃত সুই ধ্বংস করলেও সিরিঞ্জগুলো বাইরে বিক্রি করে দেয়।

৫.৮ উপসংহার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসরত নাগরিকদের প্রদত্ত সেবায় কিছু সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। সীমাবদ্ধতার মধ্যে জনবল এবং আর্থিক সমস্যা মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া জনগণের অসচেতনতা মানসম্পন্ন সেবার প্রতিবন্ধক। নাগরিকরা সেবা (সনদ সংগ্রহ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণের ক্ষেত্রে, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং কর, বিচার সালিশ, পানি পরিসেবা) নিতে গিয়ে যে ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয়ে থাকে তার মধ্যে ঘুষ আদায়, সময়ক্ষেপণ, বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা বা কম দেওয়া, দায়িত্বে অবহেলা, বরাদ্দ তুলে আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীর হস্তক্ষেপ, দালাল কর্তৃক হয়রানি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তার এলাকার টিআর, কাবিখা'র বরাদ্দ আনতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অনেক সময় গোডাউন থেকে কম বরাদ্দ পায়। সালিশ বিচারে নারী সদস্যদের মতামতের গুরুত্ব অনেকসময় দেওয়া হয় না, এবং নারী সদস্যদের ওপর চেয়ারম্যান/ মেয়র প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া বিচার-সালিশের লিখিত রায় বাদি-বিবাদিকে প্রদান করা হয় না এবং সংরক্ষণ করা হয় না। ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নথি ঘুষের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান; বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় করের পুনঃমূল্য নির্ধারণ নিয়মিত নয়। আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ময়লা পরিবহনকারী গাড়ির চালকেরা ময়লা পরিবহনে বরাদ্দ ট্রিপের তুলনায় কম ট্রিপ দেয় এবং অব্যবহৃত ট্রিপের তেল বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করে। আবর্জনা অপসারণ কাজে নিয়োজিত অনেক কর্মচারী প্রায়ই তাদের কাজ থেকে বিরত থাকে এবং এর সুযোগ নিয়ে কনজারভেন্সি ইন্সপেক্টররা কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার সময় অবৈধভাবে আংশিক টাকা কেটে রাখে।

অধ্যায় ছয়

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

প্রশাসনের সফল বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিকাশ হয়। বিকেন্দ্রীকরণের একটি প্রধান মাধ্যম 'ক্ষমতার হস্তান্তর' প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালী করা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি। স্থানীয় সরকার খাত শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, আর্থিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বাস্তবায়নও গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এসব নিয়ামক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিটি প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।[৮৩] স্থানীয় পর্যায়ে সঠিক এবং যোগ্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের একমাত্র স্বীকৃত উপায় অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো নিম্নরূপ।

- **নির্বাচন আয়োজন সংক্রান্ত:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কে পরিচালনা করবে, কীভাবে করবে তা বলা থাকলেও সময় নির্ধারণ তথা তফসিল ঘোষণা কে করবে, সে সম্পর্কে কোনো আইনে[৮৪] সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় নির্ধারণ এবং তফসিল ঘোষণার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব খাটানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সব সরকারই আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে কখনো বিলম্বিত আবার কখনো দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। উল্লেখ্য, পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও শুধু সরকারের অনীহার কারণে ২০০২ সালের পর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।[৮৫] আবার আইন করে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুইভাগ করা, অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ এবং তাদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা, এসব কিছু এই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনকে আরও বিলম্বিত করছে যা একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯-এর ৩৪ ধারা মতে মেয়াদ পূর্তির প্রায় চার মাস পূর্বে ২০১৩ সালে ১৫ জুন রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন করা হয়। ফলে নব-নির্বাচিতদের নামের গেজেট প্রকাশ, শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণ এবং পূর্ববর্তী পরিষদের মেয়াদপূর্তির সাপেক্ষে জনপ্রতিনিধিত্ব কে করবে সে বিষয়ে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে নব-নির্বাচিতদের নামের গেজেট প্রকাশ ও শপথ গ্রহণ যথাসময়ে হলেও পূর্ববর্তী পরিষদের মেয়াদপূর্তির জন্য তাদের তিনমাস পর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

- **নির্বাচনে দলীয় প্রভাব:** স্থানীয় সরকার নির্বাচন দল-নিরপেক্ষ হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন আচরণ বিধিমালায় উল্লেখ রয়েছে।[৮৬] দল থেকে পদত্যাগ করে প্রার্থীরা নির্বাচন করলেও দল থেকেই সমর্থনের নামে তাদের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়। কোনো প্রার্থী দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করতে চাইলে, দল থেকে তাকে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করার কারণে অনেক প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আবার দল থেকে পদত্যাগ করে যারা দলের সমর্থন নিয়ে নির্বাচন করে, নির্বাচন শেষে তারা আবার দলীয় পদে ফিরে আসে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালের উপজেলা নির্বাচন, ২০১৩ সালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দলের তৃণমূলে একক প্রার্থী দেওয়ার নির্দেশ যায়। যারা এই নির্দেশ অমান্য করে প্রার্থী হয়, তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যেমন দল থেকে বহিষ্কার, পদ স্থগিতকরণ, কারণ দর্শানো নোটিস প্রেরণ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে দল-নিরপেক্ষ স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয়েছে।

---

[৮৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৫৯(১)।

[৮৪] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯; উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮; জেলা পরিষদ আইন ২০০০; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯; স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯।*

[৮৫] উদাহরণ হিসেবে দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, 'অবিলম্বে ডিসিসি নির্বাচনের তফসিল চাই আর টালবাহানা নয় ', সম্পাদকীয়, ২৩ মে ২০১৩; ঢাকা সিটি নির্বাচনে আগ্রহ নেই সরকারি দলের', ১৮ জুন ২০১৩; রাজনৈতিক কৌশলের জালে আটকা ডিসিসি নির্বাচন http://inbnews24.com/inb-news-1269.php (২০ মে ২০১৪); ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এতো ভয় কেন? http://www.prothombangladesh.net/2014/04/21/ (২০ মে ২০১৪); DCC polls couldn't be held for ministry's negligence: Shah Nawaz-http://unbconnect.com/nawaz-bnf/#&panel1-1 (২০ মে ২০১৪); DCC poll delay for government nod-http://news.priyo.com/story/2010/dec/03/13233-dcc-poll-delay-government-nod (২০ মে ২০১৪)।

[৮৬] *সিটি কর্পোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০০৮*, ধারা ৩; *পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০*, ধারা ৬ (২-ঙ); *উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৩*, ধারা ৮ (৪); *ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০*, ধারা ৬ (২-ঙ)।

▪ **অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ:** নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা পরিষদগুলো গঠন করার বিধান রয়েছে।[৮৭] কিন্তু এখন পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে ২০১১ সালে রাজনৈতিক বিবেচনায় দলীয় এবং অনির্বাচিত ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে (শারমীন ২০১৪)। এই নিয়োগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে যেমন অসঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও অন্তরায়। আবার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দু'জন ভাইস চেয়ারম্যানের নির্বাচন হলেও, এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়নি, ফলে উপজেলা পরিষদও কার্যত অকার্যকর হয়ে আছে।

৬.২ আর্থিক সক্ষমতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আর্থিক সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই নিজস্ব পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব বাজেট থাকতে হবে। নিচে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হল।

৬.২.১ সরকারের বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল বাজেট পরিকল্পনা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অনুদানের পরিমাণ নিজস্ব আয় থেকে বেশি হয়। তাই বাজেট পরিকল্পনা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে তার শতাংশ উল্লেখ করে ছক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় এবং সে অনুযায়ী বাজেট পরিকল্পনা করা হয়। সরকারের এই অনুদানের পরিমাণ ইউনিয়ন পরিষদের মোট বাজেটের ৫৬% থেকে ৯০%, পৌরসভার ক্ষেত্রে ৫৬% থেকে ৮২% এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ৪৮% থেকে ৭৯% পর্যন্ত হয়।

সারণি ৬.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সরকারি ও প্রকল্প বরাদ্দের অনুদান (%)	নিজস্ব আয় (%)
জেলা পরিষদ	৩২-৬০	৪০-৬৮
উপজেলা পরিষদ	২৫-৫১	৪৯-৭৫
ইউনিয়ন পরিষদ	৫৬-৯০	১০-৪৪
পৌরসভা	৫৬-৮২	১৮-৪৪
সিটি কর্পোরেশন	৪৮-৭৯	২১-৫২

সূত্র: বিভিন্ন সরকার প্রতিষ্ঠানের ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৩-১৪ এর বাজেট থেকে প্রস্তুতকৃত।[৮৮]

৬.২.২ বাজেটে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়া: অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা একত্রে আলোচনার মাধ্যমে বাজেটে বরাদ্দের জন্য চাহিদা স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করে। গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ অনেক সময় কম দেওয়া হয়। বরাদ্দ বেশি পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক প্রভাব উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২-১৩ অর্থবছরে একটি ইউনিয়নের বাজেট প্রণয়নের সময় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১৮ লক্ষ টাকা কিন্তু তারা পেয়েছে মাত্র তিন লক্ষ এক হাজার টাকা।

৬.২.৩ নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা: সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন খাত থেকে কর, রেইট এবং ফিস-এর মাধ্যমে আয় করতে পারে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস পরিশিষ্ট ৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে)। কিন্তু বাস্তবে এসব প্রতিষ্ঠানের আয় খুবই সীমিত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মূল আয়ের একটি উৎস হচ্ছে ইমারত বা ভূমির বার্ষিক মূল্যের ওপর কর, কিন্তু তা যথাযথভাবে আদায় করা হয় না। অনেক সময় জনপ্রতিনিধিরা তাদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর, রেইট, টোল প্রভৃতি আদায় না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালে ডিসিসি নির্বাচনে মেয়রের বিজয়ের পেছনে যেসব বিষয় ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে পাঁচ বছর অন্তর হোল্ডিং কর না বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি ছিল অন্যতম। এর ফলে এখন পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর পুনঃনির্ধারিত হয়নি। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক স্থাবর সম্পত্তি, রাস্তাঘাট, খেয়াঘাট, হাটবাজার, ফেরিঘাট প্রভৃতি রয়েছে যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের অভাবের কারণে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ফলে আয়ের পরিমাণ বাড়ার পরিবর্তে কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা ব্যতিত এবং সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই সিটি কর্পোরেশন পরিষদের গাছ, স্থাবর সম্পত্তি, রাস্তাঘাট, খেয়াঘাট, হাটবাজার, ফেরিঘাট দখল করে নেয় (শারমীন ২০১৪)। তবে এক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেত কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক একই রাজনৈতিক দলের হওয়ায় কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

---

[৮৭] *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৪(২)।

[৮৮] চারটি ইউনিয়ন পরিষদ, চারটি উপজেলা পরিষদ, সাতটি জেলা পরিষদ, ছয়টি পৌরসভা, পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন থেকে চার অর্থবছরের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৬.৩ জবাবিদিহিতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হলে অবশ্যই এসব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমের জন্য জনগণ ও প্রশাসনের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

৬.৩.১ আর্থিক জবাবদিহিতার অভাব: আইন অনুযায়ী, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনগণের পরিদর্শনের জন্য কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে রাখবে এবং এ সম্পর্কে জনগণের আপত্তি ও পরামর্শ বিবেচনায় নেবে, এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব স্থায়ী কমিটি এবং জনগণের সামনে তুলে ধরবে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে।[৮৯] কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, অনেক উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে প্রতি বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব জনগণের পরিদর্শনের জন্য কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে রাখা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু মেয়র/ চেয়ারম্যান এবং হিসাবরক্ষক/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানে, এমনকি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাও জানে না। অনেক ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি কার্যকর থাকে না এবং জনগণের সামনে আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরা হয় না।

৬.৩.২ প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ বা দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করে তাকে শাস্তির সম্মুখীন করার ঘটনা নগণ্য। তথ্যদাতাদের মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী হলেও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং লবিং করে তদন্ত প্রক্রিয়াকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে। অনেক সময় কোনো কর্মকর্তা অধীনস্থ কর্মচারীর দুর্নীতি, অপরাধ বা কর্মে গাফিলতির জন্য শাস্তি দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করে ইউনিয়ন বা দলের নেতারা সেই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অবমাননাকর কটূক্তি, স্লোগান প্রভৃতি উপায়ে হয়রানি করে। ফলে কমকর্তারা বেশিরভাগ সময় কর্মচারীদের অন্যায্য দাবি পূরণ করতে বাধ্য হয়। তথ্যদাতাদের মতে, একাধিক ব্যক্তি নিয়মিত দেরিতে অফিসে আসে, কিন্তু এজন্য তাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

৬.৩.৩ বাজেটে জনমতের প্রতিফলন বাস্তবায়ন না হওয়া: আইন অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর শুরু হওয়ার পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন তাদের নিজস্ব বাজেট প্রণয়ন করতে হয়[৯০] ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার বাজেটের ওপর সাধারণ জনগণের মতামত নেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, বাজেটের বাস্তবায়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনমতের প্রতিফলন থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো ইউনিয়ন পরিষদ উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে বাজেট প্রণয়ন করে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে প্রেরণ করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাজেটটি জেলা পর্যায়ে পাঠায়, কিন্তু পরবর্তীতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আর মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় না। ফলে দেখা যায়, সাধারণ জনগণের মতামতের প্রতিফলন স্থানীয় বাজেটে নথিভুক্ত হলেও তা বাস্তবায়িত হয় না।

চিত্র ৬.১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণে সীমাবদ্ধতা

[৮৯] *উপজেলা পরিষদ আইন*, ১৯৯৮, ধারা ৩৯; *জেলা পরিষদ আইন* ২০০০, ধারা ৪৬; *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৯৩, *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৭৭; *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫৮।

[৯০] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯, ধারা ৫৭; *উপজেলা পরিষদ আইন*, ১৯৯৮, ধারা ৩৮; *জেলা পরিষদ আইন* ২০০০, ধারা ৪৫; *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন*, ২০০৯, ধারা ৯২, *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন*, ২০০৯, ধারা ৭৬।

৬.৩.৪ জনগণের কাছে প্রত্যক্ষ জবাবদিহিতার অভাব: আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সরকার লিখিত আদেশের মাধ্যমে বরখাস্ত করতে পারে।[৯১] এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শুধু জেলা পরিষদ ছাড়া বাকি প্রায় সবগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হলেও তাদের কার্যক্রমের জন্য জনগণের কাছে নয়, সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। এছাড়া উপজেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্য অর্থাৎ উপজেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়রদের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে এসব সদস্যদের উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার আইনি বাধ্যবাধকতা নেই, এবং তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না।

৬.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিচের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬.৪.১ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের প্রভাব: আইন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে সংসদ সদস্যরা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।[৯২] কিন্তু বাস্তবে সংসদ সদস্যরা এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে উপদেশ নয়, বরং নির্দেশ দিয়ে থাকে। স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যরা প্রভাব বিস্তার করে বলে কয়েকটি গবেষণায় উঠে এসেছে (আকরাম ২০১৩; শারমীন ও আকরাম ২০১৩; শারমীন ২০১৪)।

৬.৪.২ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নিয়ন্ত্রণ: উপজেলা ও জেলা পরিষদ আইনে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে।[৯৩] কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হয়।[৯৪] ফলে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

৬.৪.৩ দলীয় রাজনীতির প্রভাব: স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে (দেখুন ৬.১)। তাছাড়া জেলা পরিষদে নির্বাচন না দিয়ে দলীয় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতির প্রভাব রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলো রাজনৈতিক দলের অফিসে পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ জেলা পরিষদে প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমাজকল্যাণমূলক কাজে বরাদ্দ নির্ধারণ (দারিদ্র্য নিরসন, জীবনমান উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান প্রভৃতি) প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলীয় কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এছাড়া দলীয় কর্মীরা জেলা পরিষদের গাড়ি ব্যবহার করে থাকে এবং প্রতিদিন তাদের চা খাওয়ানোর জন্য ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পরিষদের অর্থ থেকে ব্যয় করা হয় (শারমীন ২০১৪)।

৬.৪.৪ স্থানীয় প্রশাসনের প্রভাব: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন প্রভাব বিস্তার করে। জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়সাধনসহ স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত ২৬ ধরনের কাজ জেলা প্রশাসক সম্পাদন করে।[৯৫] ফলে জেলা পরিষদ এ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। একইভাবে উপজেলা পরিষদে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাচিবিক সহায়তা[৯৬] দেওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে (রহমান ও শারমীন ২০১১)।

৬.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ঘাটতি

গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পদ্ধতিগত সংস্কার, তাদের কৃত্য, কৃতি এবং দক্ষতার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি একটি সমন্বিত ও সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২ সালে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকার 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করে।[৯৭] এই শুদ্ধাচার কৌশলের বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই কৌশলপত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে যেসব কর্মকৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে - স্থানীয় পর্যায়ে সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন; স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা-পদ্ধতির উন্নয়ন; স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি; সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে

[৯১] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯*, ধারা ৩৪; *উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১*, ধারা ১৩; *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ১০; *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯*, ধারা ৩১, ৩২; *স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯*, ধারা ১২, ১৩।

[৯২] *উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮*, ধারা ২৫; *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৩০।

[৯৩] *উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮*, ধারা ৪২; *জেলা পরিষদ আইন ২০০০*, ধারা ৪৯।

[৯৪] *প্রাগুক্ত*।

[৯৫] বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ৪।

[৯৬] *উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮* (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), ধারা ৩৩।

[৯৭] *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, ২০১২*, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ; স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু স্থিরীকরণ; দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ; স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও তার ভিত্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ। কৌশলপত্রের প্রণীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পর্যায়ে শুধু বরাদ্দ বিতরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ দেখা যায়। বরাদ্দ বিতরণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতীয় বাজেটে টাকার অংকে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও বরাদ্দের হার কমে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। তবে বতর্মান (২০১৩-২০১৪) অর্থবছরের বাজেটে বিগত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট থেকে বরাদ্দ কম ধরা হয়েছে। শুধু এলজিএসপিতে বরাদ্দ বিতরণে জনসংখ্যা এবং আয়তন বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া অন্য পাঁচটি নির্দেশকের (আয়ের পরিসর বৃদ্ধিকরণ, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ, সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ, জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিতকরণ, স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রবর্তন) ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই (বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট ৫)।

৬.৬ সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান শক্তিশালীকরণ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত আসনের নারী প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন) নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধিমালা না থাকায়[৯৮] তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে নারী প্রতিনিধিরা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। এছাড়া স্থায়ী কমিটি, বিচার ও সালিশ এবং বাজেট প্রণয়নে নারী প্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না (হক ও অন্যান্য ২০১২)।

৬.৭ উপসংহার

রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দেশে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার নানামুখী আলোচনা-সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়ে ওঠেনি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর প্রশাসনের কর্তৃত্ব, প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির পরিবর্তে অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ, সরকারি অনুদান নির্ভর বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা, নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব, বাজেট এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনমতের প্রতিফলন বাস্তবায়ন না হওয়া, আইন প্রণেতাদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর নজরদারি ও স্থানীয় উন্নয়নে অযাচিত হস্তক্ষেপ, এসকল বিবিধ কারণে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার খাত আজও গড়ে উঠতে পারেনি।

[৯৮] তবে নারী সদস্যদের কার্যক্রম সংক্রান্ত কয়েকটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

অধ্যায় সাত

উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১ উপসংহার

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার খাতের উপস্থিতি ব্রিটিশ আমল থেকে লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে একটি সমন্বিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার ফলে স্থানীয় উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। কিন্তু স্থানীয় উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার পরও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি।

গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার খাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে।

আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ) সংসদ সদস্যরা উপদেষ্টা হলেও বাস্তবে তারা উপদেশ নয়, নির্দেশ দিয়ে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে না।

আইন অনুযায়ী সবগুলো স্থায়ী কমিটি গঠিত না হওয়া, কোনো কোনো স্থায়ী কমিটি গঠিত হলেও কার্যকর না থাকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জনবলের স্বল্পতা, পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব এবং প্রকল্প পরবর্তী তত্ত্বাবধানের অভাবে উন্নয়নমূলক কাজের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়ে থাকে। এছাড়া নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি উল্লেখযোগ্য।

গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে। যেমন ধারণা হতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রতা, প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন করা, পিপিআর অনুসরণ না করা, দরপত্র কিংবা কোটেশন পদ্ধতিতে কাজ পেতে ঘুষ দেওয়া, বিল ওঠানোর জন্য ঘুষ দেওয়া, ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে এবং প্রকল্পের সকল কাজ না করে অর্থ আত্মসাৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। সেবা (সনদ সংগ্রহ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণের ক্ষেত্রে, ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং কর, বিচার সালিশ, পানি পরিসেবা) নিতে গিয়ে ঘুষ, বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কেটে রাখা বা কম দেওয়া, বরাদ্দ আত্মসাৎ, সময়ক্ষেপণ, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীর হস্তক্ষেপ, দালাল কর্তৃক হয়রানি প্রভৃতি দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়।

সার্বিকভাবে দেখা যায়, স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার খাতের অর্জন ইতিবাচক, তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব না থাকলে অর্জন আরও বেশি হতে পারত। স্থানীয় সরকার খাতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতির পেছনে দুই ধরনের নিয়ামক চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে বাহ্যিক নিয়ামক যেমন, সরকারের নিয়ন্ত্রণ, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, দীর্ঘসূত্রতা, সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি, অপর্যাপ্ত বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ নিয়ামক হিসেবে জনবল ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, তদারকির ঘাটতি, নীতিমালা ও বিধিমালার ঘাটতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের অভাব এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সাথে স্থানীয় উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে এ খাতকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৭.২ স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ

স্থানীয় সরকার খাতে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতির কারণ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত করা যায়।

৭.২.১ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনি সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অর্থাৎ প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, বাতিল বা স্থগিতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে।

৭.২.২ রাজনৈতিক দলীয়করণ: স্থানীয় সরকার খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইনে সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা রাখার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় পর্যায়েও প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হয়। এছাড়া প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অর্থাৎ দরপত্রে অংশগ্রহণ থেকে শুরু কার্যাদেশ প্রদান এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রভাবকে শক্তিশালী করার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ২০০৯' আইন হিসেবে প্রণীত হয়, যেখানে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই দুই কোটি টাকা পর্যন্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের বিধান রাখা হয়, এবং বলা হয় ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয়কার্যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না।[৯৯] এছাড়া যেসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বিরোধী দলের সমর্থক তারা এলাকায় তেমন উন্নয়ন কাজ করতে পারে না।[১০০]

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন) এবং সংস্থার প্রশাসনিক পর্যায়ে কর্মীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়।

৭.২.৩ সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ করা যায়। নবম সংসদ ও দশম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হবে, এবং এ প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালী করার জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।

৭.২.৪ দীর্ঘসূত্রতা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রকল্পের ধারণা হতে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রভাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়ন, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা না করা, স্কিমের নাম পরিবর্তন করা, অনুমোদনের জন্য স্বাক্ষর দিতে দেরি করা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তহবিলে টাকা না থাকা, অবৈধ অর্থের প্রত্যাশায় অর্থ ছাড় না করা প্রভৃতি পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবনের হোল্ডিং কর নির্ধারণের প্রক্রিয়াতে ধীরগতি এবং ভবন উন্নয়নের নথি যথাযথ লিপিবদ্ধ না হওয়ায়, কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। এই দীর্ঘসূত্রতার কারণে রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা আরও কমে যায়।

৭.২.৫ নীতিমালা ও বিধিমালার ঘাটতি: স্থানীয় সরকার খাতকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধিমালার ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধিমালা নেই। এ কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না। এছাড়া লজিস্টিকস ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা ও স্থায়ী কমিটির কাজের আওতা সংক্রান্ত বিধিমালা নেই।

৭.২.৬ আইন, বিধিমালার প্রয়োগের ঘাটতি: স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠন না করা, নাগরিক সনদ না থাকা, ওয়ার্ড সভা না হওয়া, নির্বাচন আচরণ বিধিমালা, সরকারি গাড়ি বিধিমালার লঙ্ঘন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, হোল্ডিং কর, ট্রেড লাইসেন্স বিধিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এর ফলে সেবা প্রদান ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭.২.৭ আর্থিক সক্ষমতার অভাব: অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় করা হয় সংস্থাপন খাতে। উন্নয়ন খাতের ব্যয় মূলত সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে না।

৭.২.৮ জনবল ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, প্রশিক্ষণ এবং পদায়নে নানা ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি থাকার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্মত কাজ এবং সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে পদায়ন, প্রশিক্ষণ না দেওয়া প্রভৃতি কারণে নানা ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, হোল্ডিং কর সংগ্রহ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক এবং দক্ষ কর্মী

[৯৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল ২০০৯'।

[১০০] উদাহরণস্বরূপ, সাভার উপজেলার বনগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিরোধীদলের সমর্থক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গাড়ি ভাঙচুরের মামলা করা হয়েছে। তাই তিনি ২০১২ সাল থেকে ইউনিয়ন পরিষদে বা কোনো জনসম্মুখে আসেন না (সাভার বেইজলাইন, ২০১২)।

নিয়োগ না দেওয়ার কারণে কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, আইএমইডি) দক্ষতা ও যোগ্যতার ঘাটতির কারণে মানসম্মত কাজ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

৭.২.৯ *তদারকির ঘাটতি:* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার তদারকি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রশাসনিক, কাজ বাস্তবায়ন এবং অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম, জনবল ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন লজিস্টিক ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭.২.১০ *সমন্বয়ের অভাব:* স্থানীয় সরকারের কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে এক কাজ বারবার করতে হয়, করের পরিমাণ কমে যায়, সম্পদ বেদখল হয়ে যায় প্রভৃতি। উদাহরণস্বরূপ, অনেক সময় রাস্তা খোঁড়াখুড়ির জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতার কারণে একই রাস্তা বারবার সংস্কারের প্রয়োজন হয়।[১০১] এছাড়া সংসদ সদস্য এবং প্রশাসনের সাথে দ্বন্দ্বের ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ক্ষমতা-বলয়ে জনগণের অংশীদারিত্বকে মেনে নিতে পারে না। তাই স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

৭.২.১১ *অপর্যাপ্ত ভাতা:* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পরিবহন ভাতা স্বল্পতার কারণে তদারকি সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কর পরিদর্শকদের মাসিক ভাতা ৬০ টাকা হওয়ার কারণে একটি ওয়ার্ডের সবগুলো হোল্ডিংয়ের তদারকি করা সম্ভব হয় না।

৭.২.১২ *দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনা:* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারণায় ঘাটতি রয়েছে। সেবাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য সাধারণ জনগণ জানতে পারে না, ফলে বিশেষকরে সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মের সম্মুখীন হয়। এছাড়া ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কর ব্যবস্থাপনা ও ট্রেড লাইসেন্স লিপিবদ্ধ হওয়া এবং কাজের সকল তথ্য নথিভুক্ত না হওয়ার ফলে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭.২.১৩ *জনসচেতনতার অভাব:* সাধারণ জনগণ তাদের তথ্য না জানা (সেবার ফিস), অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হওয়া, এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তির আওতায় আসা, সনদ সংগ্রহ, ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ, বিচার-সালিশ প্রভৃতি সেবা পেতে জনগণ দুর্নীতির শিকার হয়।

৭.৩ স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

স্থানীয় সরকার খাতের বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ বিতরণ, ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া, প্রকল্প প্রণয়ন, দরপত্র ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া প্রভৃতি, প্রভাব ফেলে। এসব অনিয়মের নিম্নলিখিত সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিহ্নিত করা যায়।

৭.৩.১ *দুর্বল স্থানীয় সরকার:* স্থানীয় সরকার দুর্বল হওয়ার পেছনে রয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ব্যবস্থায় সরকারি এবং রাজনৈতিক প্রভাব, কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন না দিয়ে অনির্বাচিত প্রশাসক নিয়োগ, সংরক্ষিত নারী সদস্য নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ না করা, অধিকাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা, বিভিন্ন প্রকল্পে দীর্ঘসূত্রতা এবং অর্থ আত্মসাৎ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দের সঠিক ব্যয় না করার ফলে আর্থিক ক্ষতি। এছাড়া কর নির্ধারণ এবং আপিল প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতার কারণে রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা কমে যায় এবং অপরিশোধিত করের পরিমাণ বেড়ে যায়, যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী হতে বাধা সৃষ্টি করে।

৭.৩.২ *প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন না হওয়া:* স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সংসদ সদস্য, স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবের কারণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন সংঘটিত হয় না, যার ভুক্তভোগী সাধারণ জনগণ। এ কারণে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরি হয় না। ফলে স্থানীয় উন্নয়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না।

---

[১০১] টিআইবি পরিচালিত ২০০৭ সালের এক জরিপে দেখা যায়, ২০০৬ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যেসব এলাকায় রাস্তাগুলো কোন না কোন কারণে খনন করা হয়েছিল সেসব এলাকার ২০.৮% এলাকায় দুইবার এবং ১৪.৬% উত্তরদাতার এলাকায় তিন বার কিংবা তারও অধিকবার আশে পাশের রাস্তাগুলো খনন করা হয়েছিল। এসব রাস্তা একটি সংস্থা কর্তৃক খনন করে যাওয়ার আগে কিংবা তৎপরবর্তী সময়েই আরেকটি সংস্থা একই রাস্তা খনন করা শুরু করে।

চিত্র ৭.১: স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

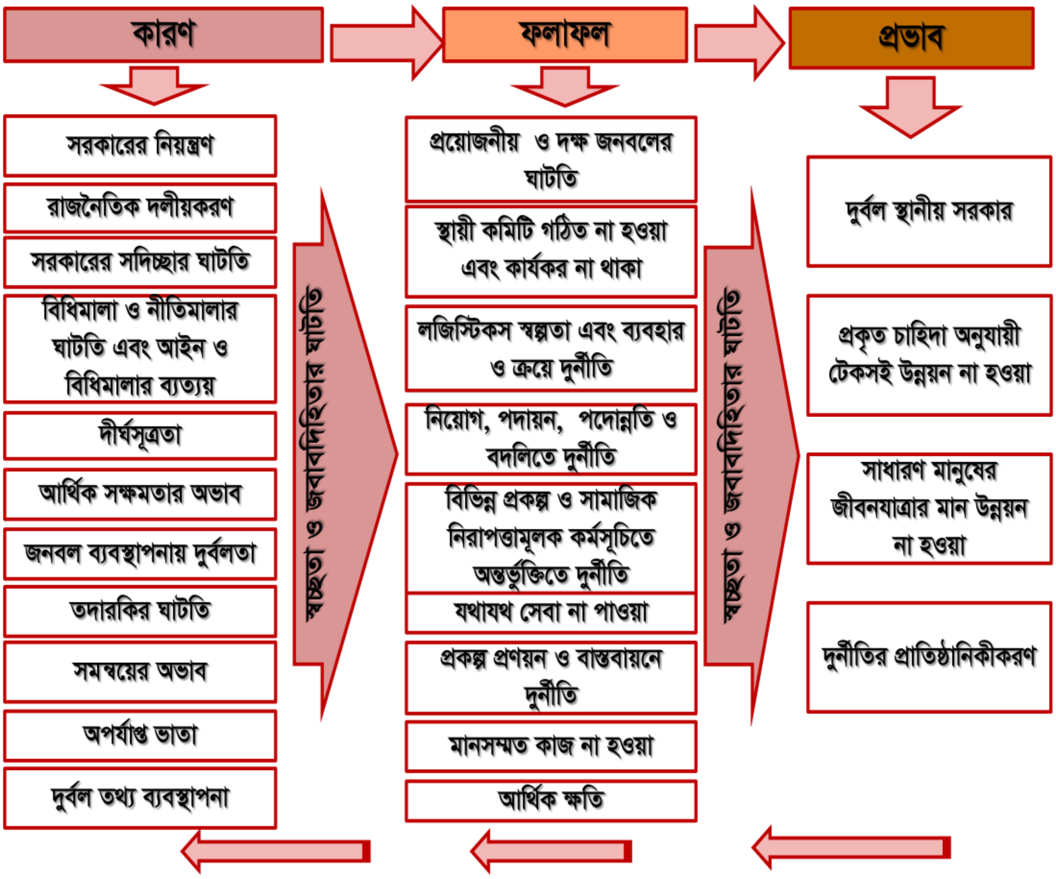

৭.৩.৩ *কাজ টেকসই না হওয়া:* বাজার স্থিতিশীল না থাকার কারণে ঠিকাদারদের কাজ করতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, এবং নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। কার্যাদেশ পাওয়ার পর ঠিকাদাররা কাজ করতে বাধ্য থাকে, অন্যথায় জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া ঘুষ দিয়ে কাজ পাওয়ার পর দরপত্রমূল্যের বরাদ্দ দিয়ে মানসম্মত কাজ করা সম্ভব নয়। কখনও কখনও অর্ধেক কাজ করার পর কাজ বন্ধ রাখতে হয়, যার ফলে কাজের গুণগত মান ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

৭.৩.৪ *জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন না হওয়া:* বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয় না।

৭.৩.৫ *দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:* রাজনৈতিক প্রভাব ও সুশাসনের দুর্বলতার কারণে স্থানীয় সরকার খাতে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৭.৪ সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ওপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে যা বাস্তবায়ন করলে স্থানীয় সরকার খাতের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

ক. নীতি নির্ধারণী পর্যায়

১. সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পরিষদ কাজ করবে।
২. প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুষম বণ্টন করতে হবে।
৩. যেসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি সেসব প্রতিষ্ঠানে দ্রুত নির্বাচনের উদ্যোগ নিতে হবে।
৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (বিশেষ করে পৌরসভার ক্ষেত্রে) সরকারি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শ্রেণির পাশাপাশি জনসংখ্যা, আয়তন এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে সরকারি বরাদ্দ সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে দ্রুত বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।
৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সংরক্ষিত নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৬. চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সকল প্রকার নিয়োগ, পদায়ন, বদলি এবং পদোন্নতি আইনানুযায়ী ও স্বচ্ছতার সাথে করতে হবে।

৭. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের এবং পৌরসভার কাউন্সিলরদের সম্মানী ভাতা বাস্তবতার সাথে মিল রেখে বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা বিভিন্ন কমিটিতে যাতে সক্রিয়ভাবে এবং দক্ষতার সাথে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে সেই জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিবদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পদমর্যাদা বাড়াতে হবে।

৮. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুণগত (কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে করানো ও সরেজমিন) এবং পরিমাণগত (বেশি সংখ্যক) মান বাড়াতে হবে।

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটিগুলোর গঠন নিশ্চিত ও সক্রিয় করতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১০. প্রকল্পভিত্তিক লজিস্টিকস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে, যেন প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে এসব লজিস্টিকস স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

১১. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের জন্য নিজস্ব নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১২. নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিসহ সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ প্রতিবছর প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞাত আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন সম্পদের ক্ষেত্রে তদন্ত করতে হবে ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাল কাজের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা যেমন বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণের সুযোগ ইত্যাদি এবং দুর্নীতির জন্য তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের নিজস্ব, হালনাগাদকৃত তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।

১৫. বাজেট প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং বাজেটে জনমতের প্রতিফলন থাকতে হবে। উন্মুক্ত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বাজেট প্রকাশ করতে হবে।

১৬. তদারকি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি ব্যবস্থায় জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।এক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে ‘জনগণের মুখোমুখি’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরা সরাসরি জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এছাড়া নাগরিক সংগঠন এবং গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে তথ্য ও পরামর্শ সেবা, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করা যেতে পারে।

১৭. ক্রয় কমিটিতে স্থানীয় সচেতন জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দরপত্র প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে এবং স্বচ্ছতার সাথে করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে।

১৮. প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অধিদপ্তরের নাগরিক সনদ থাকতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। নাগরিক সনদ দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রকাশ করতে হবে এবং এর প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিক সনদে অবশ্যই প্রযোজ্য সকল সেবার ফি উল্লেখ করতে হবে।

১৯. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক সকল তথ্য, লাইসেন্স প্রদানের এবং কর নির্ধারণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং কর সংক্রান্ত নোটিস সকলের অবগতির জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

২০. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সকল আর্থিক লেনদেন রশিদের মাধ্যমে হতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে।

২১. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে ত্রাণ ও অন্যান্য ভাতার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কাউন্সিলর বা সদস্যদের পাশাপাশি সুশীল সমাজের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং ভিজিএফ, ভিজিডি ও অন্যান্য সকল ভাতার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

২২. প্রতিটি বিচার ও শালিসের রায় লিখিত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাদী-বিবাদীকে তা প্রদান করতে হবে।

২৩. কর ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করতে হবে এবং এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

২৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বক্স স্থাপন করতে হবে ও প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অর্থ বিভাগ (২০১৩) '*বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩*', অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আকরাম, শাহজাদা এম (২০১৩) '*নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা*', ঢাকা: টিআইবি।

আলম, মো. খোরশেদ (২০১২) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: ঝিনাইদহ পৌরসভা*', ঝিনাইদহ: ঝিনাইদহ সনাক।

আহমেদ, তোফায়েল (১৯৯৯) '*বিকেন্দ্রীকরণ, মাঠ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার*', ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

জাহিদ, মো. মনিরুল ইসলাম (২০১১) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: ফরিদপুর পৌরসভা*', ফরিদপুর: ফরিদপুর সনাক।

জাহিদ, মো. মনিরুল ইসলাম (২০১১) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: কুষ্টিয়া পৌরসভা*', কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া সনাক।

টিআইবি (২০১২) '*সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২*', ঢাকা।

ঢাকা সিটি করপোরেশন (২০০৭) '*নিরীক্ষা প্রতিবেদন: ২০০৬-২০০৭*', ঢাকা।

মাহমুদ, তানভীর (২০০৬), 'করাপশন ডেটাবেজ ২০০৫', ঢাকা: টিআইবি।

মোস্তফা, মো. গোলাম (২০১১) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: কুড়িগ্রাম পৌরসভা*', কুড়িগ্রাম: কুড়িগ্রাম সনাক।

মোস্তফা, মো. গোলাম (২০১৩) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: ৩নং শ্রীমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ*', শ্রীমঙ্গল: শ্রীমঙ্গল সনাক।

মোস্তফা, মো. গোলাম (২০১৩) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা*', সনাক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মোস্তফা, মো. গোলাম (২০১৩), '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: ৩নং খাদিমনগর ইউনিয়ন পরিষদ*', সিলেট: সিলেট সনাক।

রহমান, মো. হাবিবুর ও নাহিদ শারমীন (২০১১) 'কার্যকর উপজেলা পরিষদ: চ্যালেঞ্জ ও করণীয়', ঢাকা: টিআইবি।

রহমান, মোঃ মকসুদুর (২০০০) '*বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন*', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ ও প্রকাশনা বোর্ড।

রহমান, ফারহানা (২০০৮) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: গাজীপুর পৌরসভা*', গাজীপুর: গাজীপুর সনাক।

রহমান, ফারহানা (২০১১) '*বেইজলাইন জরিপ: যশোর পৌরসভা*', যশোর: যশোর সনাক।

রহমান, ফারহানা (২০১২) '*বেইজলাইন জরিপ: উজানগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ*', কুষ্টিয়া: কুষ্টিয়া সনাক।

শারমীন, নাহিদ (২০১৪) '*স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*', ঢাকা: টিআইবি।

শারমীন, নাহিদ ও শাহজাদা এম আকরাম (২০১৩) '*স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর: সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়*', ঢাকা: টিআইবি।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (২০০৮) '*সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮*', বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্থানীয় সরকার বিভাগ, '*বাৎসরিক বাজেট, ২০১৩-২০১৪*', অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

হক, মো. শরিফুল ও অন্যান্য (২০১২) 'স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারী জনপ্রতিনিধি: সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও করণীয়', ঢাকা: টিআইবি।

হোসেন, মোহাম্মদ (২০১২) '*সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড জরিপ: মাদারীপুর পৌরসভা*', মাদারীপুর: মাদারীপুর সনাক।

Asian Development Bank (2005) '*Supporting Urban Governance Reform (ADB TA NO. 4003-BAN)*', Dhaka.

Bhattacharya, Debapriya, Mobasser Monem and Umme Shefa Rezbana (2013) '*Finance for Local Government in Bangladesh: An Elusive Agenda*', Dhaka:CPD.

CARE (2012) '*Poor and Extremely Poor Women's Engagement in Local Government Development Initiatives*', Dhaka.

Chowdhury, Amirul Islam (2005), '*Instruments of Local Financial Reform and Their Impact on Service Delivery, Institutional and Development Concerns: Case Studies of India And Bangladesh*', Dhaka:Centre for Urban Studies.

http://www.lgd.gov.bd/images/pdf/download/lgd/four%20yrs%20achievment.pdf (১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

http://www.mof.gov.bd/en/index.php?option=com_content&view=article&id=236&Itemid=1 (২৩ ডিসেম্বর ২০১৩)

Ministry of Finance, Government of Nepal, National Budget, 2014, http://www.mof.gov.np/uploads/cmsfiles/file/English_complete(1)_20130729034813.pdf (২৫ এপ্রিল ২০১৪)

Panday. Pranab Kumar (2011) '*Local Government System in Bangladesh: How Far is it Decentralised?*' in Lex Localis - Journal of Local Self-Government, Vol. 9:3, pp. 205 - 230.

PPRC (2012) '*Social Safetynets in Bangladesh*' (Volume2: Ground Realities and Policy Challenges), Dhaka.

Siddiqui, Kamal (1999) '*Local Government in Bangladesh*', Dhaka: University of Press Limited.

Talukdar, Mohammad Rafiqul Islam (2013) '*Decentralized Local Governance Policy Framework for Bangladesh*', Dhaka:IGS.

TIB (2009) '*Baseline Survey Report: LGIs*', Dhaka.

TIB (2011) '*Baseline Survey Report: LGIs*', Dhaka.

Union Budget, 2013-2014-http://indiabudget.nic.in/budget2013-2014/ub2013-14/bag/bag2013.pdf (২৫ এপ্রিল ২০১৪)

পরিশিষ্ট ১: কেস স্টাডি - এলজিএসপি-২

স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প-২ (এলজিএসপি-২) হল স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি কর্মসূচি-যার লক্ষ্য হচ্ছে থোক বরাদ্দের আকার বাড়ানো ও নাগরিকদের নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করার প্রাথমিক উদ্যোগগুলোকে সংহত করা। এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হল বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী এবং কিছু সংস্থা যারা ইউনিয়ন পরিষদগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের সাথে জড়িত, যেমন নীতি তৈরি এবং গ্রহণ, বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এইসব সংস্থার মধ্যে আছে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) অফিস ও বেসরকারি নিরীক্ষা অফিস, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি) এবং উপজেলা পরিষদ। এই প্রকল্পে চারটি কম্পোনেন্টের আওতায় পাঁচ বছরে (নভেম্বর ২০১১ থেকে নভেম্বর ২০১৬) মোট ৫৩৪.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে যার মধ্যে ২৪২.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং বাকি ২৯২.১৮ মার্কিন ডলার দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক।[১০২] কম্পোনেন্টগুলো নিম্নরূপঃ

- ***কম্পোনেন্ট ১:*** এই কম্পোনেন্টের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার, নলকূপ ও ল্যাট্রিন স্থাপন, বিদ্যালয় মেরামত, বৃক্ষ রোপণ ও ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোট ৪৯১.৯৬ মিলিয়ন ইউএসডি বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে মূল ব্লক গ্রান্টে ৪৩৬.৭৬ মিলিয়ন ইউএসডি বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এই বরাদ্দ জনসংখ্যা এবং আয়তন ভেদে বিতরণ করা হয়। এই কম্পোনেন্টের আরেকটি অংশ হল পারফর্মেন্স নির্ভর গ্রান্ট, যা ইউনিয়ন পরিষদগুলোর পারফর্মেন্সের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়। এর পরিমাণ ৫৫.২ মিলিয়ন ইউএসডি।
- ***কম্পোনেন্ট ২:*** উন্নত তথ্য প্রবাহ ও ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য এই কম্পোনেন্টের আওতায় ১২.৪ মিলিয়ন ইউএসডি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- ***কম্পোনেন্ট ৩:*** প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য এই কম্পোনেন্টের আওতায় ২৬.৮৩ মিলিয়ন ইউএসডি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- ***কম্পোনেন্ট ৪:*** প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য এই কম্পোনেন্টের আওতায় ২.৬৭ মিলিয়ন ইউএসডি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এলজিএসপি-২ খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মঃ রাজস্ব বরাদ্দের বাইরে ইউনিয়ন পরিষদে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ সমৃদ্ধ প্রকল্প হল এলজিএসপি। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় যেসকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখা যায়, তার সিংহভাগই এলজিএসপির আওতায়। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই প্রকল্পের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও, এই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব দুর্নীতির সাথে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব, উপজেলা পর্যায়ে এলজিইডি'র এ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এসব অনিয়ম এবং দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে, একই প্রকল্প একাধিকবার দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া প্রকল্প (কাগজপত্রে প্রকল্পের নাম থাকলেও বাস্তবে কিছু করা হয়নি) দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, অর্ধেক কাজ করে অর্থ আত্মসাৎ, পূর্বের শেষ হওয়া প্রকল্পের কাজ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, চলমান এক প্রকল্পের কাজ অন্য প্রকল্পে দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, নলকূপ ও রিং কালভার্ট স্থাপন না করে অর্থ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পের স্কিমের নকশা প্রণয়নে সহায়তা পেতে বরাদ্দের ২%-৩% এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীকে দিতে হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল অনুযায়ী প্রত্যেক ওয়ার্ডে শতকরা পাঁচজন ভোটারের উপস্থিতি ও মতামতের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা না মেনে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা কোনো সভা না করে পছন্দের লোক দিয়ে তদারকি কমিটি গঠন করে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করে। অনেক সময় এ প্রক্রিয়ায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারেরও জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

এদিকে স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্পের (এলজিএসপি-২) অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দেশের ৩০ জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিরা এই প্রকল্প থেকে প্রায় দুই কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এ ছাড়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ১১২টি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়ায় আপাতত এসব ইউনিয়নে কোনো ধরনের বরাদ্দ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়[১০৩]। সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) চিঠিও পাঠানো হয়। ২১ মে, ২০১৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়।

---

[১০২] Project Information Document (PID), Appraisal Stage, LGSP II.

[১০৩] 'প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ: ৩০ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত, বরাদ্দ বন্ধ ১১২ ইউনিয়নে', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ মে, ২০১৩।

পরিশিষ্ট ২: কেস স্টাডি - আরবান পার্টনারশিপ ফর পভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর)

আরবান পার্টনারশিপ ফর পভার্টি রিডাকশন (ইউপিপিআর) হল শহুরে এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহিত সর্ববৃহৎ উদ্যোগ। এই প্রকল্পটি ইউএনডিপি কর্তৃক ২০০০-২০০৭ সাল পর্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত লোকাল পার্টনারশিপ ফর আরবান পভার্টি অ্যালেভিয়েশন প্রোজেক্ট (এলপিইউপিএপি)-এর অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সুশাসন, যৌথ অংশীদারিত্ব এবং মৌলিক সেবার মাধ্যমে শহরের দরিদ্র পরিবারগুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি (বিশেষ করে নারীদের), তাদের নিজেদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং যে চাহিদাগুলোকে তারা নিজেরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তা মেটানোর জন্য বাংলাদেশের ৩০টি শহরের জনগোষ্ঠীর সাথে ইউপিপিআর প্রকল্প কাজ করে। ইউকেএইডে'র অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপির যৌথ ব্যবস্থাপনায় শহরের জনগোষ্ঠীকে এই সহায়তা প্রদানে ইউপিপিআর প্রকল্প কাজ করে। প্রকল্পটি সাতটি নির্দেশককে ভিত্তি করে কাজ করছে, যা ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে এবং অগাস্ট ২০১৪-এ শেষ হবে। এবং এই প্রকল্পের মোট বাজেট ৬৭ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড।

এই প্রকল্পটি এলজিইডি'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে ইউএনডিপি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যে ক'টি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাতে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেগুলোর একটি ওয়ার্ডকে একটি ক্লাস্টার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক একটি ক্লাস্টারে ৫-১০টি কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) রয়েছে। এক একটি সিডিসি-এর অধীনে ২৫০-৩০০টি পরিবার আছে। এই সিডিসিগুলোর তদারকি করে মূলত সিডিসির দলনেতারা। এছাড়া সার্বিকভাবে ইউএনডিপি'র টাউন ম্যানেজার তত্ত্বাবধান করে। সিডিসি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথমে একটা এলাকায় গিয়ে, ঐ এলাকার গণ্যমান্য সহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে একটা সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে ঐ এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোকে ঐ সমাবেশে উপস্থিত মানুষের মতামতের ভিত্তিতে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও হতদরিদ্র এই চারভাগে ভাগ করে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এরপর নিম্নবিত্ত ও হতদরিদ্রের মধ্যে থেকে ঐ তালিকাভুক্ত পরিবারগুলোর মতামতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ণয় করে একে একে তাদের সাহায্য-সুবিধা দেওয়া হয়। এভাবে একটা বৈজ্ঞানিক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সুবিধাভোগী বাছাই করা হয় বলে সিডিসি গঠন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বা অনিয়ম করার সুযোগ কম থাকে।

ইউপিপিআর প্রকল্পে দুর্নীতি ও অনিয়ম: কোনো কোনো ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রভাব বিস্তার করে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু এলাকায় এই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে বাজেটের টাকা আসার পর সেখান থেকে মেয়র, নির্বাহী প্রকৌশলী এবং টাউন ম্যানেজারের যোগসাজশে কিছু অংশ (যেমন বরাদ্দ যদি ১০ লাখ টাকা হয়, সেখান থেকে দুই লাখ টাকা) কেটে রাখা, স্থানীয় কৌশলগত অংশীদার নির্বাচনে টাউন ম্যানেজারের পছন্দ মতো, ক্ষেত্রমতে অযোগ্য সংগঠন নির্বাচন এবং এই অযোগ্য সংগঠনকে কম টাকায় কাজ করিয়ে নিয়ে বেশি টাকা বিল করে অর্থ আত্মসাৎ, ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণকারীদের ট্রেনিং ভাতা কম দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি। এছাড়া অফিস রক্ষণাবেক্ষণ খাতে সরকারি বরাদ্দের অংশে বড় রকমরে অনিয়ম হওয়ার এবং যে কোনো উপায়ে অনিয়মকৃত অংশের সমন্বয় করার বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে।

তবে প্রকল্পের নির্দেশকের সংখ্যাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কারণ প্রকল্পটিতে এর সাতটি নির্দেশকের বিপরীতে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তার পাঁচটির-ই লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প শেষ হবার আট মাস আগেই (ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত) শত ভাগের বেশি অর্জিত হয়েছে। বাকি দু'টি ৯০ ভাগের বেশি অর্জিত হয়ে গেছে, যা প্রকল্প শেষ হবার আগেই শত ভাগ বা তার বেশি অর্জিত হবে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

পরিশিষ্ট ৩: দরপত্র নিয়ন্ত্রণ

বেশ কিছু উপায়ে স্থানীয় পর্যায়ে দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হল।

- **বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বেই ঠিকাদার অবহিত হওয়া:** কোন ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হবে তা পূর্ব থেকেই অনেক সময় নির্ধারিত থাকার ফলে দেখা যায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই অনেক সময় ঠিকাদার জেনে যায়। ফলে নির্ধারিত ঠিকাদার কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য দরপত্রের শিডিউল কেনা ও জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে থাকে।
- **পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ:** 'সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮' (পিপিআর ২০০৮) অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বহুল প্রচারিত কমপক্ষে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি সংবাদপত্রে দরপত্রের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হয়। তথ্যদাতা এবং বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, অনেক সময় বহুল প্রচারিত নয় এমন জাতীয় পত্রিকায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় অনেক ঠিকাদার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে জানতে পারে না। বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও তা এলাকায় পৌঁছানোর পূর্বেই সব কপি নির্ধারিত ঠিকাদার কিনে নেয়। অনেক সময় দেখা যায় পত্রিকায় দুটো সংস্করণ থাকে, এবং প্রথম সংস্করণে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একটি জেলায় বিক্রি হয় না এমন দুইটি সংবাপত্রে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার অভিযোগ পাওয়া যায়।[১০৪]
- **শিডিউল প্রাপ্তির সীমিত সময় এবং শিডিউল ক্রয়ে রাজনৈতিক প্রভাব:** তথ্যদাতাদের মতে, যেহেতু ঠিকাদার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত পূর্বেই নেওয়া থাকে, তাই অনেক সময় সংবাদপত্রে দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাথে সাথেই দরপত্রের শিডিউল পাওয়া যায় না । দরপত্রের শিডিউল দেরিতে ছাড়া হয় যেন কম শিডিউল বিক্রি হয় ও জমা পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়ের তিন দিন আগে শিডিউল ছাড়া হয়, ফলে অনেক ঠিকাদার শিডিউল কিনতে পারে না, বা অনেকে কিনতে পারলেও যথাসময়ে জমা দিতে পারে না। অনেক সময় সরকার দলের নেতাকর্মীরা দরপত্র প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। তারা শিডিউল কিনতে দেয় না বিরোধী দলীয় ঠিকাদারদের।
- **রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র শিডিউল জমা:** শিডিউল যে পরিমাণ বিক্রি হয় তার সবগুলো জমা পড়ে না, কারণ রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে অনেকসময় তিন থেকে পাঁচটি শিডিউল জমা দেওয়া হয়[১০৫]। রাজনৈতিক সমঝোতা কয়েকভাবে হয়ে থাকে: শিডিউল জমা না দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া[১০৬]; একই দলের কর্মীদের মাধ্যমে শিডিউল ক্রয় এবং নিজেদের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে শিডিউল জমা। এছাড়া রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচিত ঠিকাদারদের আলোচনার মাধ্যমে যারা কাজটা পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি আলোচনার মাধ্যমে কাজের জন্য যে সর্বোচ্চ মূল্য দেবে তাকে কাজটা দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। সেক্ষেত্রে অন্যান্য ঠিকাদাররা বিনিয়োগ ছাড়াই কিছু টাকা পায়[১০৭]। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে ঠিকাদার কাজ পেতে ইচ্ছুক বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশ হয় সে সাধারণত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে অন্য ঠিকাদারদের শিডিউল জমা না দেওয়ার জন্য সমঝোতা করে থাকে এবং আলোচনার মাধ্যমে কে কে শিডিউল ফেলবে সেটাও ঠিক করা হয়। আবার একই ঠিকাদার নামে বেনামে শিডিউল ফেলে এবং অন্যদের সাথে সমঝোতা করেন। অনেক সময় কাজ পাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নেয়।
- **দরপত্রের শিডিউল জমা দিতে না দেওয়া:** রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে শিডিউল জমা দেওয়ার সময় ঠিকাদাররা রাজনৈতিক দলীয় কর্মীদের দ্বারা বাঁধার সম্মুখীন হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতার অনুমতি ছাড়া দরপত্র জমা দেওয়া সম্ভব হয় না[১০৮]।
- **স্থানীয় প্রশাসন থেকে অসহযোগিতা:** শিডিউল ক্রয় এবং জমা দেওয়ায় সমস্যার সম্মুখীন হলে স্থানীয় প্রশাসন থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় না, বরং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন থেকে সুবিধা নিয়ে থাকে। অনেক সময় দরপত্রের বাক্স ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটে থাকে। তখন স্থানীয় প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয় না।
- **অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার:** স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার করে দরপত্র কেনা থেকে শুরু করে কার্যাদেশ নিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। যাদের লাইসেন্সে বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং বড় অংকের কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে, কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দেখা যায় ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতা-কর্মী রয়েছে যাদের কাজ পাওয়ার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, অন্যদিকে অনেকের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লাইসেন্স রয়েছে কিন্তু কাজ পাওয়ার মতো রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা নেই সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা অন্যের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লাইসেন্স ব্যবহার করে থাকে[১০৯]।
- **দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত না হওয়া:** দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা ঠিকাদারদের কাগজপত্র যাচাই করা হয় না। ঠিকাদারদের সাথে আগেই মূল্যায়ন কমিটির সমঝোতা হয়ে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা দরপত্র মূল্যায়ন করা হয় না।

---

[১০৪] 'ভোলায় দরপত্র জমাদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ নভেম্বর ২০১২।

[১০৫] পিপিআর-এর নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে তিনটি শিডিউল জমা পড়লে দরপত্রের বাক্স খোলা যাবে।

[১০৬] 'কাজ পাওয়ার আগেই টাকা ভাগাভাগি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ নভেম্বর ২০১২।

[১০৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।

[১০৮] 'কাজ পাওয়ার আগেই টাকা ভাগাভাগি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ নভেম্বর ২০১২।

[১০৯]বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন শারমীন ও আকরাম (২০১৩)।

পরিশিষ্ট ৪: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎস

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম	আয়ের উৎস	আইনের ধারা এবং তফসিল
ইউনিয়ন পরিষদ	ইমারত/ভূমির বার্ষিক মূল্যের ওপর কর অথবা ইউনিয়ন রেইট, ইমারত পরিকল্পনা অনুমোদন ফি, পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তির ওপর কর, সিনেমা, ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী, অন্যান্য আমোদ- প্রমোদ এবং চিত্ত বিনোদনের ওপর কর, পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং পারমিটের ওপর ফি, হাট-বাজার, ফেরী ঘাট হতে ফি (লীজ মানি), হস্তান্তরিত জলমহাল, পাথরমহাল, বালুমহালের আয়ের সরকারের নির্ধারিত অংশ, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের অংশ, নিকাহ নিবন্ধন ফি, ভূমি ইন্নয়ন কর সংক্রান্ত আয়ের অংশ, বিজ্ঞাপনের ওপর কর প্রভৃতি।	ধারা ৬৫ হতে ৭০, চতুর্থ তফসিল
উপজেলা পরিষদ	হস্তান্তরিত জলমহাল, ফেরিঘাট, হাটবাজার হতে ইজারালব্ধ আয় হতে সরকারের নির্ধারিত অংশ, সিনেমা হল, নাটক, যাত্রা, রাস্তা আলোকিতকরণের ওপর ধার্যকৃত কর, পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ওপর ধার্যকৃত ফিস, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোনো খাতের ওপর কর, রেইট, টোল ফিস হতে আয়।	ধারা ৫৪, চতুর্থ তফসিল
জেলা পরিষদ	স্থাবর সম্পত্তির ওপর ধার্য করের অংশ, বিজ্ঞাপনের ওপর কর, রাস্তা, ফেরী, পুলের ওপর টোল, পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক সম্পাদনের জন্য রেইট, বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত কাজের ওপর ফিসের মাধ্যমে আয় করে থাকে।	ধারা ৫১, দ্বিতীয় তফসিল
পৌরসভা	ভূমি উন্নয়ন, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্য, ইমারত নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ আবেদন, পেশা, বৃত্তি, বিজ্ঞাপন, পণ্য আমদানী ও রপ্তানি, জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, যিয়াফত, সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ, মোটর গাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন, বাতি, অগ্নি, ময়লা নিষ্কাশন, জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন, পানি কল ও পানি সরবরাহের জন্য, পৌরসভা হতে প্রদত্ত লাইসেন্স অনুমোদন ও অনুমতির জন্য, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জনসমাবেশ, পশু জবাই, কোন বিশেষ কাজের জন্য কর, রেইট এবং ফিস ধার্য করা হয়। সরকার কর্তৃক আরোপিত করের ওপর উপকর ধার্য করার বিধান রয়েছে।	ধারা ৯৮, তৃতীয় তফসিল
সিটি কর্পোরেশন	স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর, ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্য, ইমারত নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ আবেদন, পেশা, বৃত্তি, বিজ্ঞাপন, পণ্য আমদানী ও রপ্তানি, জন্ম, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, যিয়াফত, সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ, মোটর গাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ওপর কর এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত করের ওপর উপকর ধার্য করার বিধান রয়েছে। এছাড়া বাতি, অগ্নি, ময়লা নিষ্কাশন, জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন, পানি কল ও পানি সরবরাহের জন্য রেইট ধার্য করার বিধান রয়েছে। কর্পোরেশন হতে প্রদত্ত লাইসেন্স অনুমোদন ও অনুমতির জন্য, কৃষি প্রদর্শনী, শিল্প প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জনসমাবেশ, পশু জবাই, কোন বিশেষ কাজের জন্য ফিস ধার্য করা হয়।	ধারা ৮২, চতুর্থ তফসিল

পরিশিষ্ট ৫: স্থানীয় সরকার বিষয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্ম সম্পাদন সূচক	সময়	বর্তমান অবস্থা
১.	সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে (জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা) স্থানীয় সরকারসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	বার্ষিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বরাদ্দ	স্বল্প মেয়াদে	জাতীয় বাজেটে টাকার অংকে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও বরাদ্দের হার কমেছে। তবে বতর্মান (২০১৩-'১৪) অর্থবছরের বাজেটে বিগত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট থেকে বরাদ্দ কম ধরা হয়েছে। এছাড়া শুধু এলজিএসপিতে বরাদ্দ বিতরণে জনসংখ্যা এবং আয়তন বিবেচনা করা হয়েছে।
২.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের ভিত্তির পরিসর বৃদ্ধিকরণ	নতুন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর সংগ্রহের সুযোগদান; 'বিক্রয় কর', 'মূল্য সংযোজন কর' আহরণ করার আইনি ভিত্তি প্রদান	মধ্য মেয়াদে	এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।
৩.	স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ	সংগঠিত নাগরিকগোষ্ঠী কর্তৃক রিপোর্ট কার্ড দাখিল এবং স্থানীয় সরকারের সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য লাভ	মধ্য মেয়াদে	এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।
৪.	স্থানীয় সরকারে (বিশেষত উপজেলা ও জেলা পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ	গাইডলাইন প্রণীত	স্বল্প মেয়াদে	এখন পর্যন্ত কোনো গাইডলাইন দেখা যায়নি।
৫.	জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিতকরণ	কর্মপরিধি নির্ধারিত ও স্পষ্টীকৃত	মধ্য মেয়াদে	এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।
৬.	স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রবর্তন	স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়ন ও তদনুসারে লোকবল নিয়োগ।	দীর্ঘ মেয়াদে	এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।
৭.	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রতিবেদন	চলমান	কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।